স্মরণিকা ১৯৭৯

SOUVENIR
1979

অষ্টম বার্ষিক ইজতেমা

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া

MAJLIS-E-KHUDDAMUL AHMADIYYA, BANGLADESH

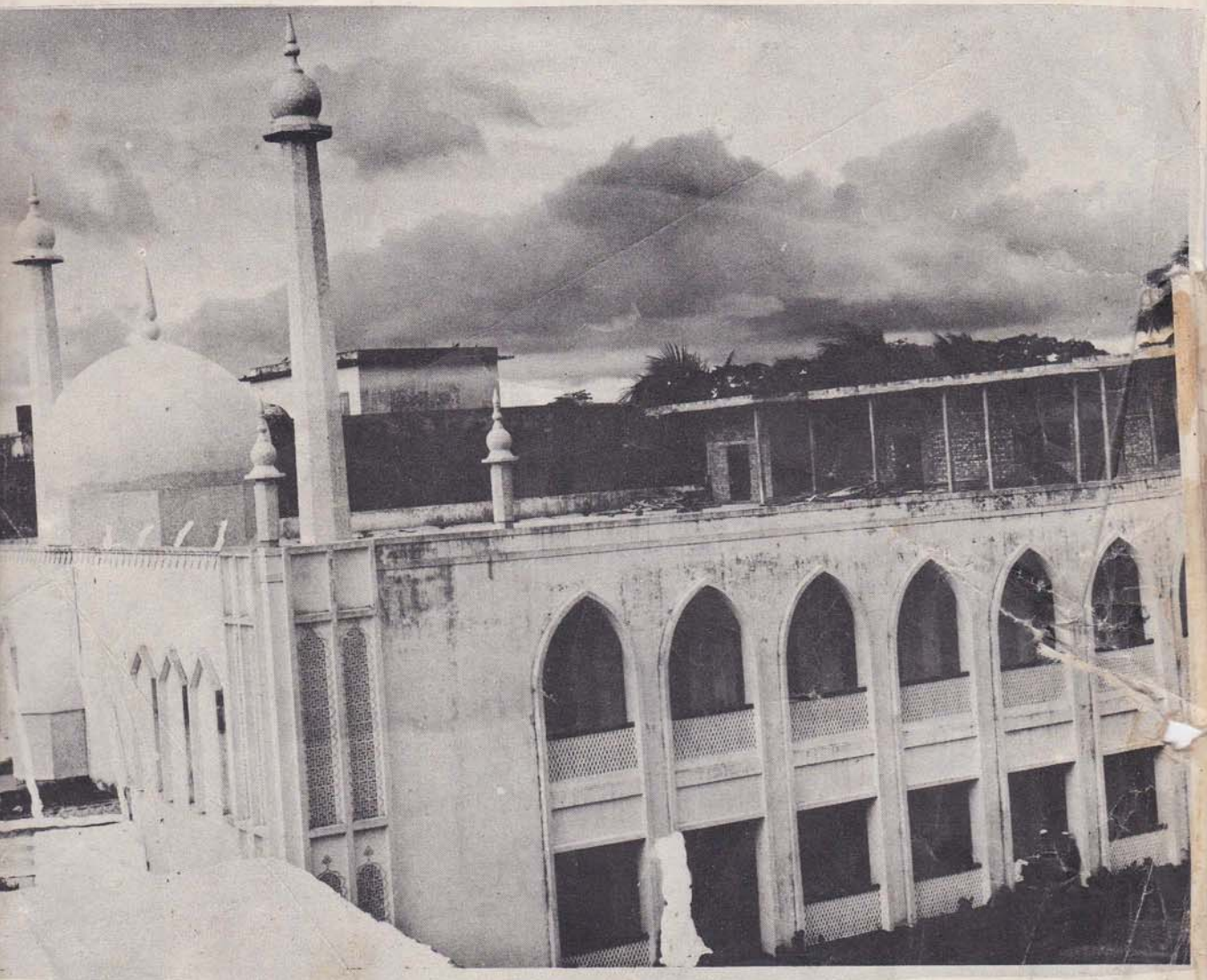

ঢাকায় নির্মীয়মান মসজিদ ও রেষ্ট হাউসের একাংশ ॥

স্মরণিকা--১৯৭৯

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল
আহমদীয়া কর্তৃক প্রকাশিত

'দারুত তবলীগ'
৪, বক্‌শী বাজার রোড,
ঢাকা, বাংলাদেশ

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার মজলিসে আমেলা

(কার্যকরী সংসদ) বর্ষ ১৯৭৮—'৭৯

১।	নায়েব সদর	মৌলবী মোহাম্মদ খলিলুর রহমান
২।	মোতামাদ	,, মোহাম্মদ আব্দুল জলিল
৩।	নায়েম মা'ল	,, মোহাম্মদ সাহাবুদ্দীন
৪।	,, তালিম ও তরবীয়ত	,, মোহাম্মদ মুতিউর রহমান
৫।	,, ইসলাহ ও ইরশাদ	,, নুরুল নওয়াব মোহাম্মদ সালেক
৬।	,, তজনীদ	,, মোহাম্মদ খায়রুল হক
৭।	,, ইশায়াত	,, আব্দুল জব্বার (অধ্যাপক)
৮।	,, ওয়াকারে আমল	,, তাসাদ্দুক হুসেন
৯।	,, খেদমতে খাল্‌ক	,, মোহাম্মদ ফজলুর রহমান
১০।	,, আতফাল	,, মোহাম্মদ নাজমুল হক
১১।	,, ছেহ্‌তে জিসমানী	,, মোহাম্মদ আখতার হুসেন
১২।	,, উমুমী	,, এ, কে, রেজাউল করীম
১৩।	,, ছানায়াত ও তেজারত	,, বশির উদ্দিন আফজাল আহম্মদ খান চৌধুরী
১৪।	,, তাহরীকে জাদীদ	,, মোহাম্মদ সাইফুর রহমান
১৫।	,, উমুরে তোলাবা	,, আব্দুল আহাদ খান চৌধুরী
১৬।	,, মোহাসেব	,, মোহাম্মদ আফজাল হুসেন (রংপুর)
১৭।	,, নায়েম মোকামী	,, মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্‌, কায়েদ, ঢাকা মজলিসে খোঃ আঃ

বিভাগীয় মজলিসের কায়েদগণের নাম

১।	বিভাগীয় মজলিস, ঢাকা	— মৌলবী এ, কে, রেজাউল করীম
২।	বিভাগীয় মজলিস, চট্টগ্রাম	— ,, এস, এ, নিজামী
৩।	বিভাগীয় মজলিস, খুলনা	— ,, আবু কাওছার
৪।	বিভাগীয় মজলিস, রাজশাহী	— ,, আব্দুর রব

জিলা মজলিসের কায়েদগণের নাম

১।	জিলা মজলিস, ঢাকা ফরিদপুর	— মৌলবী বোরহানুল হক (তেজগাঁ)
২।	,, ,, কুমিল্লা ও সিলেট	— ,, আব্দুল হাদী (বি, বাড়িয়া)
৩।	,, ,, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী	— ,, নাজীর আহমদ ভুঁইয়া
৪।	,, ,, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও জামালপুর	— ,, আহমদ তবশির চৌধুরী
৫।	,, ,, রাজশাহী ও দিনাজপুর	— ,, সামছুর রহমান
৬।	,, ,, রংপুর ও বগুড়া	— ,, মাহবুবুল ইসলাম (রংপুর)
৭।	,, ,, খুলনা	— ,, খালেদ হুজ্জাতুল ইসলাম সাঈদ
৮।	,, ,, কুষ্টিয়া, যশোর ও পাবনা	— ,, অধ্যাপক রজিব উদ্দীন আহমদ
৯।	,, ,, বরিশাল ও পটুয়াখালী	— ,, আব্দুল বারী (কুকুয়া)

মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব,
আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

মৌলযী মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ,

মোহাম্মদ আব্দুল জলিল,

এ, কে, রেজাউল করিম,

এস, এ, নিজামী

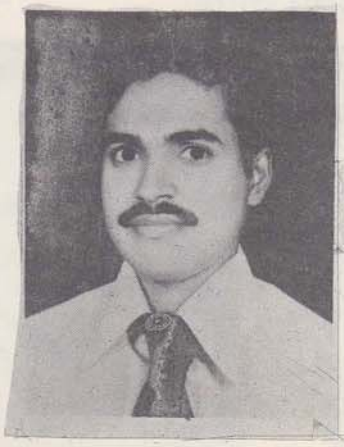

মোহাম্মদ আবদুর রব,

আবু কাওসার,

স্মরণিকায় যাঁরা লিখেছেন

আহমদ তৌফিক চৌধুরী

মাজহারুল হক

মৌলবী আহমদ সাদেক মাহমুদ

ওবায়দুর রহমান ভূইঞা

অধ্যাপক আমীর হোসেন

শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

নাজমুল হক

ক্বারী মাহফুজুল হক

"ইসলাম সে না ভাগো—
রাহে হুদা এহি হ্যায়।
আয় সুন্‌নে ওয়ালো জাগো—
শামসুজ্জোহা এহি হ্যায়॥"

—"ইসলাম থেকে পলায়ন করো না (কায়ণ) সত্য পথ ইহাই।
হে শ্রোতাবৃন্দ! জাগ্রত হও—ইহাই সত্যের সমুজ্জল সূর্য॥"

[হযরত মসীহ মওউদ—আঃ]

"হাম তো রাখতে হ্যাঁয় মুসলমানোঁ কা দ্বীন।
দিল্ সে হ্যাঁয় খুদ্দামে খাতমুল মুরসালীন॥"

—"আমরা তো মুসলমানদের ধর্মে বিশ্বাসী। অন্তর থেকে
আমরা খাতমুল মুরসালীন (সাঃ)-এর সেবকবৃন্দ॥"

[হযরত মসীহ মওউদ—আঃ]

"মসীহে-ওয়াক্ত আজ দুনিয়া মেঁ আয়া।
খোদা নে আহ্‌াদ কা দিন হ্যায় দেখায়া॥
মুবারক উয়ো জো আব ঈমান লায়া।
সাহাবা সে মেলা জব মুঝ্‌কো পায়া॥"

—"যুগের মসীহ্ আজ দুনিয়ায় এসেছেন, খোদা প্রতিশ্রুতির যুগকে
দেখায়েছেন। সে-ই মুবারক, যে ঈমান এনেছে। সাহাবাদের
সঙ্গে মিলেছে, আমাকে যখন সে পেয়েছে॥"

[হযরত মসীহ মওউদ—আঃ]

"প্রত্যেক প্রভাত যেন সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি তাকওয়ার সহিত নিশি যাপন করিয়াছ এবং প্রত্যেক সন্ধ্যা যেন সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি ভীতির সহিত দিবস যাপন করিয়াছ।"
—হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)।

স্মরণিকা

১৯৭৯

"সেই সময় শীঘ্র আসিতেছে যখন খোদাতায়ালার নুর প্রতিটি জনপদে বিস্তার লাভ করিবে এবং গ্রাম-গঞ্জ, নগর-বন্দর সর্বত্র মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইয়ে ওয়া সাল্লামের পবিত্র নামের ধ্বনি উত্থাপিত হইবে।
— হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)।

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ পৃষ্ঠা

১। পবিত্র কুরআনের আলো
—অনুবাদ ও তফসির : মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ (সদর মুরুব্বী) ১
২। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পবিত্র বাণী ৫
৩। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর অমৃত বাণী ৭
৪। হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর পবিত্র পয়গাম ৯
৫। বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম আমীর সাহেবের পয়গাম ১১
৬। কেন্দ্রীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার মোহতারম সদর সাহেবের পয়গাম ১২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ "পরিচিতি"

১। ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলনের পটভূমি
—মৌলবী মোহাম্মদ, আমীর বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া ১৩
২। বিশ্বব্যাপী ইসলাম-প্রচার ও আহমদীয়া জামাত
—মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, নায়েব সদর, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ১৯
৩। মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্দেশ্য ও কর্ম-পদ্ধতি
—মোঃ হাবিবুল্লাহ, কায়েদ, ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ৩০
৪। কার্য বিবরণী : বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া
—মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, মোতামেদ, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ৩৫
৫। ঢাকা বিভাগীয় মজলিসের কার্য বিবরণী
—এ, কে, রেজাউল করীম, বিভাগীয় কায়েদ ৩৮
৬। চট্টগ্রাম বিভাগীয় মজলিসের কার্য বিবরণী
—এস, এ, নিজামী, বিভাগীয় কায়েদ ৪০

৭। রাজশাহী বিভাগীয় মজলিসের কার্য বিবরণী
—মোঃ আব্দুর রব (বিভাগীয় কায়েদ) ৪২
৮। খুলনা বিভাগীয় মজলিসের কার্য বিবরণী
—মোঃ আবু কাওসার (বিভাগীয় কায়েদ) ৪৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ "ইসলামী শিক্ষা ও প্রচার"

১। ওফাতে মসীহ ও নজুলে মসীহ—আহমদ তৌফিক চৌধুরী ৪৪
২। যীশু খৃষ্ট ক্রুশে মরেন নাই : বাইবেলের সাক্ষ্য—মাজহারুল হক ৫০
৩। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতা—মৌলবী মোহাম্মদ,
আমীর, বাংলাদেশ আঃ আঃ ৫৬
৪। খতমে নবুওত—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী ৬০
৫। ইসলাহের গুরুত্ব ও সঠিক পদ্ধতি
—ওবায়দুর রহমান ভুঁইয়া (নাজেমে আলা, বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ) ৬৮
৬। ইসলামে খেলাফতের গুরুত্ব—অধ্যাপক আমীর হোসেন ৭৩
৭। ইসলাম ও বাণীয়ে ইসলাম (সাঃ) সে ইশ্‌ক—(নযম)
—হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ, মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)
অনুবাদ : শাহ মুস্তাফিজুর রহমান ৮৪
৮। আহমদীয়া জামাতের যুবকদের প্রতি নসিহত—(নযম)
—হযরত মীর্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)
অনুবাদ : ক্বারী মাহফুজুল হক ৮৮
৯। আল্লাহর ইচ্ছায় সন্তুষ্টি—(নযম)
—হযরত মীর্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)
অনুবাদ : নজমুল হক ৯০
১০। বসন্তের গজল—মোঃ মোহাম্মদ ছলিমুল্লাহ্ (সদর মোয়াল্লেম) ৯১
১১। আপনার তালাশে আছি
—হযরত মীর্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ৯২
১২। ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব ও হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর গুরুত্ব
—মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ (সদর মুরুব্বী) ৯৩
১৩। বাংলাদেশের কয়েকজন শ্রদ্ধেয় আমীর ১০১
১৪। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসার আব্দুস সালাম ১০৭
১৫। কতকগুলি বিদেশী আহমদীয়া প্রচার-মিশনের ঠিকানা ১০৯

❋❋❋

"যুবকদের সংশোধন ব্যতীত জাতি সমূহের সংশোধন হইতে পারে না।"
—হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ)

"আক্‌ল কো দ্বীন পর—
হাকেম না বানাও হরগেজ,
ইয়ে তো আন্‌ধী হায়—
গর নাইয়ারে ইল্‌হাম না হো।"

—"বুদ্ধিকে ধর্মের উপর বিচারক হিসাবে স্থান দিও না। ইহা তো অন্ধ, যদি কিনা ইলহামের সূর্যালোক সহায়ক না হয়॥"

[হযরত মুসলেহ্ মওউদ—রাঃ]

"গায়রত কি জা হ্যায় ঈসা বেন্দা হো
আসমাঁ পর—
মদফুন হো জমীন মেঁ
শাহে জাহাঁ হামারা!"

—"ঈসা (আঃ) যদি আকাশে জীবিত থাকেন, আর আমাদের বিশ্ব-সম্রাট (সাঃ) জমীনে কবরস্থ থাকেন তা'হলে ইহা গয়রতের বিষয়॥"

[হযরত মসীহ্ মওউদ—আঃ]

"মকামে উ মবিঁ আয্ রহে তাহকীর।
বা-দওরানাশ রসুলাঁ নাজ করদন্দ॥"

—"তাঁহার মর্যাদার প্রতি অবজ্ঞাভরে
দৃষ্টি-পাত করিও না,
তাঁহার কার্যকাল সম্বন্ধে
নবীগণও গৌরব করে গেছেন।"

[হযরত মসীহ্ মওউদ—আঃ]

"ইন্নী মুহীনুম্ মান আরাদা এহানাতাকা'

—"যারা তোমার অপমান করতে চাইবে।,
আমি তাদেরকে অপমানিত করব।"

[ইলহাম : হযরত মসীহ্ মওউদ—আঃ]

প্রথম পরিচ্ছেদ

পবিত্র কোরআনের আলো

সূরা আল-মুমেনুন : প্রথম ১৫ আয়াতের তরজমা ও তফসির

তরজমা ঃ

১। আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিতেছি যিনি অযাচিত অফুরন্ত দানকারী ও বার বার দয়া প্রদর্শনকারী।

২। কামেল মুমেনগণ নিশ্চয় সফলকাম হইবে।

৩। যাহারা তাহাদের নামাজে বিনয়াবনত হয়।

৪। এবং যাহারা (সকল প্রকার) বৃথা কাজ হইতে বিরত থাকে।

৫। এবং যাহারা (নিয়মিত) যাকাত দান করে।

৬। এবং যাহারা তাহাদের ছিদ্রসমূহ বা লজ্জাস্থান গুলির সংরক্ষণ করে,

৭। তাহাদের স্ত্রীগণ অথবা যাহাদের উপর তাহাদের দক্ষিণ হস্ত অধিকার লাভ করিয়াছে তাহাদের ব্যতীত। সুতরাং এই সকল লোক নিন্দিত নহে ;

৮। এবং যাহারা এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কিছুর অভিলাষ করে তাহারা অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী।

৯। এবং যাহারা তাহাদের আমানত সমূহ এবং তাহাদের অঙ্গীকারের প্রতি যত্নবান থাকে।

১০। এবং যাহারা তাহাদের যাবতীয় নামাজের হেফাজত করিতে থাকে।

১১। এই সকল লোকই প্রকৃত উত্তরাধিকারী

১২। যাহারা ফিরদৌস (জান্নাত)-এর উত্তরাধিকারী হইবে ; সেখানে তাহারা চিরকাল বাস করিবে।

١- بسم الله الرحمن الرحيم ٥

٢- قد افلح المؤمنون ٥

٣- الذين هم في صلوتهم خاشعون ٥

٤- والذين هم عن اللغو معرضون ٥

٥- والذين هم للزكوة فاعلون ٥

٦- والذين هم لفروجهم حافظون ٥

٧- الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ٥

٨- فمن ابتغى وراء ذالك فاولئك هم العادون ٥

٩- والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون ٥

١٠- والذين على صلواتهم يحافظون ٥

١١- اولئك هم الوارثون ٥

١٢- الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ٥

১৩। আমরা মানুষকে কাদামাটির সারাংশ হইতে সৃষ্টি করিয়াছি।

১৪। অতঃপর তাহাকে একটি সংরক্ষিত স্থানে (মাতৃগর্ভে) বীর্য স্বরূপ স্থাপন করি।

১৫। তারপর বীর্যকে জমাট রক্তে রূপান্তরিত করি, তারপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করি, অতঃপর সেই মাংস পিণ্ডটিকে অস্থি সমূহে রূপান্তরিত করি, তারপর সেই অস্থি গুলির উপর মাংস পরাইয়া দেই। অতঃপর উহাকে আর এক আকারে বা এক নুতন সৃষ্টিতে আনয়ন করি। সুতরাং অত্যন্ত বরকতময় সেই আল্লাহ্ যিনি সর্বাপেক্ষা উত্তম সৃষ্টিকারী।

(সুরা আল-মুমেনুন, ১-১৫ আয়াত)

١٣- و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ٥

١٤- ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ٥

١٥- ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر - فتبارك الله احسن الخالقين ٥

(سورة المؤمنون ١—١٥)

সংক্ষিপ্ত তফসীর ঃ

এই আয়াতগুলিতে বলা হইয়াছে যে, কুরআন করীমের উপর ঈমান আনয়নকারীগণের সফলতা অবধারিত এবং এই সকল সত্যকার মুমেনকে শুধু নাজাত নয় বরং ফালাহ্ তথা পূর্ণ সাফল্য দানের নিশ্চয়তা প্রদান করা হইয়াছে। নাজাতের অর্থ শুধু দুঃখ-কষ্ট, অনিষ্ট ও পাপ হইতে মুক্তিলাভ। যদিও ইহাও ভাল কথা, কিন্তু উত্তম ও পূর্ণ পর্যায়ের গুণ হইল সকল প্রকারের কল্যাণ ও পুণ্যের অধিকারী হওয়া এবং যে উদ্দেশ্যে মানবকে সৃষ্টি করা হইয়াছে উহাতে সফলতা অর্জন করা। সেই জন্য মুমেনের প্রকৃত মোকাম ও মর্যাদা শুধু নাজাত লাভ করা নয় বরং ফালাহ্ হাসিল করা। ফালাহ্ এরূপ এক মোকাম যাহাতে নাজাত স্বতঃই অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, সে যেন আল্লাহতায়ালার গুণাবলীর বিকাশ-স্থলে পরিণত হয় এবং খোদাতায়ালার সহিত মিলনের যে স্বভাবজ স্পৃহা মানব-প্রকৃতিতে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে তদনুযায়ী সে যেন তাহার প্রকৃত প্রেমাস্পদ খোদাতায়ালার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করে যাহার ফলে তাহার দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সকল পর্যায়ে সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে সে জীবনের পূর্ণ সাফল্যের অধিকারী হইতে পারে। তজ্জন্য যে সকল উপায় ও গুণাবলীর প্রয়োজন, তাহা এই আয়াত সমূহে বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ মানুষের দৈহিক সৃষ্টি যেমন আলোচ্য আয়াত সমূহের শেষের তিন আয়াতে বর্ণিত ছয়টি পর্যায়ে ক্রমোন্নতির মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে, তেমনি তাহার এই আধ্যাত্মিক সৃজনও ছয়টি আধ্যাত্মিক পর্যায়ক্রমিক উন্নতির মাধ্যমে পূর্ণত্বে উপনীত হয়। নিম্নে সফলকাম মুমেনগণের ছয় পর্যায়ে বিভক্ত গুণাবলীর বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া হইল।

১। মোমেনগণ খোদাতায়ালার এবাদত শুধু বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক রূপেই পালন করে না বরং তাহাদের নামাজ সমূহ আন্তরিক নিষ্ঠা, বিনয় ও আবেগভরে সদা নিয়মিত আদায় করে। ইহার ফলে মাটি হইতে উৎপন্ন উপাদেয় খাদ্যাদি ভক্ষণে মানবের মধ্যে সৃষ্ট বীর্য্য (যাহা আধ্যাত্মিক সৃজন প্রক্রিয়াতে উত্তম আকায়েদ ও শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে মানুষের হাসিলকৃত ঈমানের তুল্য) মাতৃগর্ভে অবস্থান লাভে যেমন মানব সৃষ্টির সূচনা হয়, তেমনি এই পর্যায়ে বিনয় ও আবেগভরা নামাজ আদায়ের দ্বারা মুমেন আধ্যাত্মিক উন্নতির সূচনামূলক স্থিতিশীলতা অর্জন করে।

২। উক্ত পর্যায়ের উন্নতি লাভের পর মুমেন যে পরবর্তী ধাপে উন্নীত হয়, তাহা হইল এই যে, তাহার প্রত্যেক প্রকারের বৃথা ক্রিয়াকাণ্ড হইতে আত্মরক্ষা করে, যেগুলিতে তাহার নিজের বা জাতির বা দেশের কোন যুক্তিসঙ্গত উপকার নিহিত নাই। যেমন, তাস, পাশা ইত্যাদি প্রকারের খেলা, যেগুলিতে সময়েরই অপচয় ঘটে—মুমেন এ সকল খেলার অংশ গ্রহণ করিয়া তাহার সময় ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতা নষ্ট করিতে পারে না। অবশ্য ইসলাম ব্যায়াম নিষেধ করে নাই, কেননা উহা মানুষের মধ্যে সাহস ও বল সঞ্চার করে। অথবা যেমন বৃথা গল্প-গুজবের আসর জমান, অথবা নিষ্কর্ম জীবন যাপন করা—এইগুলি মানুষের মূল্যবান সময় ও কর্ম ক্ষমতাকে নষ্ট করিয়া দেয়। অথবা অযথা টাকা পয়সার অপব্যয়, অথবা যেমন পুরুষ -দিগের অলংকার ও রেশম জাতীয় পোষাক ব্যবহার কিংবা স্বর্ণ ও রোপ্যের তৈয়ারী বাসন-পত্র ব্যবহার ইসলামে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। মুমেন এই সকল বৃথা কাজ হইতে বিরত থাকে। ইসলাম নারীদিগকেও সীমাতিরিক্ত অলংকার পরিধানে নিষেধ করিয়াছে যাহা দেশের অর্থনৈতিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটায় বা তাহাদের মধ্যে ফখর সৃষ্টি করে এবং লোভ ও অতৃপ্তিবোধকে উত্তেজিত করে। এই প্রসঙ্গে আয়াতে বর্ণিত 'লগভ' বা বৃথার আওতায় সেই সকল জিনিষও পড়ে, যেগুলি শুধুমাত্র সীমাতিরিক্ত সাজ-সজ্জা বা গর্ব ও অহংকার প্রদর্শনার্থে বিত্তশালী ব্যক্তিগণ নিজেদের গৃহে সাজাইয়া রাখেন। তেমনিভাবে সিনেমা ও থিয়েটারও ইহার পর্যায়ভুক্ত। ইহাদের অপব্যবহার ব্যক্তি ও জাতির মূল্যবান সম্পদ এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সুচিতাকে ধ্বংস করিয়া দেয়। তেমনিভাবে 'হুম আনেল লাগভে মুরেজুন -এর মধ্যে এই দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে যে, প্রকৃত মুমেনগণ শুধু বৃথা কাজ হইতেই বিরত থাকে না, বরং বৃথা চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণা হইতেও বিরত থাকিতে চেষ্টিত থাকে। বস্তুতঃ বৃথা চিন্তা-ভাবনা যাহাদের অভ্যাসে পরিণত হয়, তাহাদের নামাজ পড়ার সময়ও বিভিন্ন অসংলগ্ন চিন্তা-ভাবনার মধ্যে হাবুডুবু খাইয়া নামাজে একাগ্রচিত্ততা নষ্ট করিয়া ফেলে। এ ধরনের বৃথা ও অসংলগ্ন চিন্তা-ভাবনা হইতে নিজেকে বিরত রাখার অভ্যাস একান্ত প্রয়োজনীয়। অন্যথায় এ ধরনের মানুষ যুক্তি সঙ্গত কথার দিকেও মনোনিবেশ করার ভারসাম্য হারাইয়া ফেলে। মুমেনের কর্তব্য, সর্বদা বৃথা ধ্যান-ধারণা হইতে নিজের চিন্তাধারাকে পবিত্র রাখিয়া উত্তম ও উপকারী ধ্যান-ধারণার ও সুচিন্তার দিকেই স্বীয় মন-মগজকে নিয়োজিত রাখা, যাহাতে তাহার চিন্তাশক্তি উন্নতি লাভ করে এবং মন ও মগজ যাহা আল্লাহতায়ালার এক বিরাট দান, বিকারগ্রস্ত না হইতে পারে।

এই পর্যায়ে মুমেনের উন্নতি দৈহিক সৃজনের সেই পর্যায়ের সমতুল্য যেখানে মানব-বীর্য মাতৃগর্ভে জমাট রক্তের রূপ ধারণ করিয়া অধিকতর স্থিতিশীলতা অর্জন করে।

৩। মুমেনগণ তদাপেক্ষা উন্নতি করিয়া এই পর্যায়ে উপনীত হয় যে, তাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ অনাথ ও দরিদ্রদিগের অভাব মোচন এবং মানব জাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সাধনের কাজে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে। মুমেনের এই পর্যায়ের উন্নতি মানবের দৈহিক সৃজনের সেই পর্যায়ের সমতুল্য, যেখানে মাতৃগর্ভে জমাট রক্ত মাংসপিণ্ডে পরিণত হইয়া দৈহিক সংগঠনের পূর্ণত্বের দিকে একধাপ আগাইয়া যায়।

৪। মুমেন এই পর্যায়ে উন্নতি লাভ করার পর যে ধাপে উপনীত হয়, তাহা এই যে, তাহারা তাহাদের ছিদ্র সমূহের হেফাজত করে, অর্থাৎ তাহাদের কর্ণ, চক্ষু, মুখ-জিহবা এবং নিজেদের লজ্জাস্থলসমূহের সংরক্ষণ করে—পরনিন্দা ও পরচর্চা করে না ও তাহা শ্রবণও করে না; অন্যের মালের প্রতি লালসার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না, নিষিদ্ধ বস্তু গুলির দিকেও তাকায়ও না যেগুলি তাহার অন্তরের পবিত্রতাকে নষ্ট করিতে পারে। তাহারা ব্যভিচারের নিকটেও যায় না বরং সতীত্বকে সার্বিকরূপে রক্ষা করে।

তাহারা নিজেদের বৈধ স্ত্রীদের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখে অথবা যুদ্ধবন্দিনীদের মধ্য হইতে যাহাদের উপর শরীয়তের বিধি-বিধান অনুযায়ী তাহাদের স্ত্রী স্বরূপে সত্বাধিকার লাভ করে তাহাদের সঙ্গেই তাহাদের কাম-সম্পর্ক সীমাবদ্ধ রাখে। এই সকল ব্যক্তি ধর্মীয় ও মানবীয় পর্যায়ে নিন্দনীয় নয়। অর্থাৎ উক্ত সীমার বাহিরে যাহারা কদম রাখে তাহারাই নিন্দিত।

এই পর্যায়ে মুমিনের উন্নতিকে মাতৃগর্ভে মাংসপিণ্ডের অস্থি লাভের সমতুল্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

৫। পঞ্চম পর্যায়ের রুহানী উন্নতি এই যে, মুমেনগণ তাহাদের যাবতীয় আমানত এবং অঙ্গীকারের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে এবং উহাদের যথাবিহিত সংরক্ষণ করে। আমানত বলিতে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত যাবতীয় শক্তি-ক্ষমতা ও অধিকার এবং তাহাদের উপর ন্যাস্ত সকল প্রকার দায়িত্বও বুঝায়, সেগুলিকে তাহারা আল্লাহ্‌র বিধি-বদ্ধ নিয়মে সঠিক স্থানে প্রয়োগ করে ও সযত্নে সকল দায়িত্ব সমূহ পালন করে এবং জাগতিক এবং ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পর্যায়ে সকল প্রকার অঙ্গীকারের মর্যাদাও তাহারা রক্ষা করে।

এই পর্যায়ে মুমেনের রুহানী উন্নতি মাতৃগর্ভে মানবের দৈহিক গঠন প্রক্রিয়ায় অস্থির উপরে মাংস পরানোর সমতুল্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

৬। রুহানী উন্নতির ষষ্ঠ পর্যায় এই যে, মুমেনগণ যাবতীয় এবাদত, ফরজ হউক বা নফল, ব্যক্তি ও ব্যষ্টিগত হউক, বা সম্মিলিত ও সমষ্টিগত, সবিশেষ যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করে। অর্থাৎ পারিবারিক ও জাতীয় পর্যায়েও তাহারা আল্লাহর এবাদত প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হয় এবং এ পর্যায়ে তাহাদের লব্ধ পূর্ণ আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যকে অম্লান ও জ্যোতির্ময় রাখার চেষ্টায় সর্বদা নিয়োজিত থাকে। জাতীয় ও জামাতী স্বার্থকে ব্যক্তি স্বার্থের উপর সদা সমুন্নত রাখে।

এই পর্যায়ে মুমেনের রুহানী উন্নতি পূর্ণত্বে উপনীত হয়, যেমন মাতৃগর্ভে উক্ত পর্যায়ে হাড়-মাংস বিশিষ্ট মানব দেহে আত্মার সঞ্চার হইয়া এক নূতন সৃষ্টির রূপ পরিগ্রহ করে অর্থাৎ পূর্ণ মানবের আকার ধারণ করে। এরূপ মুমেনগণ পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার ওয়াদাকৃত সকল পুরস্কারের অধিকারী হয়—ইহজগতেও এবং পরকালেও।

[হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ) ও হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ (রাঃ) কতৃক প্রণীত যথাক্রমে বারাহীনে আহ্‌মদীয়া; ৩য় খণ্ড এবং তফসীর কবীর অবলম্বনে]

—মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পবিত্র বাণী

১। কাজের নিয়ত সম্বন্ধে ঃ— "ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াতে ওয়া ইন্নামা লেবুরেম রীয়েম মা-নাওয়া।" (বুখারী)।

অর্থঃ-নিশ্চয়ই আমল বা কাজ নিয়তের উপর নির্ভর করে এবং প্রত্যেকে সেই জিনিষেরই 'বদল' পায় যাহা সে ইরাদা করিয়াছিল।"

২। চারিটি বড় 'গুনাহ' ঃ— "আল কাবায়েরু আল-ইশরাকু বিল্লাহে ওয়া ওকুকুল ওয়ালেদাইনে ওয়া কাতলুন নাফসে ওয়াল ইয়ামিনুল গামুস।" (বুখারী)।

অর্থঃ— বড় গুনাহ হইল এই সকল—(১) আল্লাহতা'লার সহিত শেরক করা (অর্থাৎ কাহাকেও বা কোন কিছুকে অংশীদার মনে করা) (২) পিতা-মাতার না-ফরমানী বা অবাধ্যতা করা, (৩) কোন নির্দোষ প্রাণী হত্যা করা এবং (৪) মিথ্যা কসম খাওয়া।

৩। ছোটদের এবং বড়দের হক ঃ-"মাল-লাম ইয়ারহাম সাগীরানা ওয়া লাম ইয়ারেফ হাক্কা কাবীরানা ফালায়সা মিন্না।" (আবু-দাউদ)।

অর্থ ঃ— আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ছোটদের উপর রহম করে না এবং বড়দের হক স্বীকার করে না, সে আমাদের মধ্য হইতে নহে।

৪। মৃত্যুহীন আমল ঃ-"এযা মাতাল ইনসানু ইনকাতায়ু আনহু আমালুহু ইল্লা মেন সালাসাতেন ইল্লা মেন সাদাকাতেন জারীয়াতেন ওয়া ইলমেন ইউনতাফায়ু বেহী ওয়া ওয়ালাদেন সালেহেন ইয়াদয়ু লাহু।" (মুসলিম)।

অর্থ ঃ—যখন কোন ব্যক্তি মারা যায় তখন তাহার সকল আমল শেষ হইয়া যায়, কিন্তু তিন ব্যক্তির তিন আমল ব্যতিত, যথা (১) সদকায়ে জারিয়া, (২) সেই জ্ঞান যাহা হইতে বহু ফায়দা উঠানো যায়, এবং (৩) সেই নেক সন্তান যে (মৃত পিতামাতার জন্য) দোয়া করে।

৫। পিতামাতার সন্তুষ্টি ঃ-"রেজার রাব্বে ফি রেযাল ওয়ালেদে ওয়া সাখাতুর রাব্বে ফি সাখাতিল ওয়ালেদ।" (তিরমিযি)।

অর্থ ঃ— মা-বাপের সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ-তায়ালার সন্তুষ্টি এবং মা-বাপের অসন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহতায়ালার অসন্তুষ্টি।

৬। "কুল্লুয যুনুবে ইয়াগফেরুল্লাহু মেন হা মাশায়া ইল্লা উকুকুল ওয়ালেদাইনে ফাইন্নাহু ইউয়াজ্জেলু লেসাহেবেহি ফিল হায়াতে কাবলাল মামাতে।" (শোয়াবুল ঈমান)।

অর্থ ঃ—গোনাহ সমূহের মধ্যে যেগুলি আল্লাহতায়ালা চাহেন মাফ করে দেন, কিন্তু মা-বাপের অবাধ্যতা তিনি মাফ করেন না, বরং সেই অপরাধের জন্য তাহার মৃত্যুর পূর্বেই ইহজীবনে তাহাকে শাস্তি দান করেন।

৭। পারস্পরিক দয়া ঃ-"লা-ইয়ারহামুল্লাহু মাল লা-ইয়ারহামুন্নাসা।" (বুখারী)।

অর্থ ঃ আল্লাতায়ালা ঐ ব্যক্তির উপর রহম করেন না, যে ব্যক্তি মানুষের উপর রহম করে না।

৮। আল-খালকু আইয়ালুল্লাহ ফা আহা-ব্বুল খালকে ইলাল্লাহে মান আহসানা ইলা আইয়ালেহি।" (শোয়াবুল ঈমান)।

অর্থ :—সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহতায়ালার পরিবার বা গৃহস্থালী স্বরূপ। অতএব মানুষের মধ্যে আল্লাহতায়ালার নিকট সেই ব্যক্তি অধিকতর প্রিয় (পছন্দনীয়) যে তাঁহার পরিবার-পরিজনের (তথা সৃষ্টি জীবের) সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করে।

৯। নেকী ও গোনাহের মধ্যে পার্থক্য :-"আল বেররু হুসনুল খুলকে ওয়াল ইসমু মাহাকা ফি সাদরেকা ওয়া কারেহ্তা আঁই-ইয়াত্তালেয়া আলাই হিন নাস।" (মুসলিম)।

অর্থ :—উৎকৃষ্ট চরিত্র বা আখলাকের নাম হইল নেকী, এবং গোনাহ হইল উহাই যাহা তোমার হৃদয়ে খটকা বাঁধায় এবং তুমি সেই কথাকে চাও না যে অন্য মানুষ তাহা জানুক।

১০। মিতব্যয়িতা, প্রেমপূর্ণ ব্যবহার এবং উত্তম প্রশ্ন : "আল একতেসাদু ফিন-নাফাকাতে নেসফুল মায়ীশাতে ওয়াততাওয়াদ্দুদু ইলান্নাসে নেসফুল আকলে ওয়া হুসনুস সুওয়ালে নেসফুল ইলমে। (শোয়াবুল ঈমান)।

অর্থ :—খরচে মিতব্যায়িতা এবং মাধ্যম পন্থা অবলম্বন করা জীবিকা নির্বাহের অর্ধেক এবং লোকের সংগে মহব্বতপূর্ণ ব্যবহার করা বুদ্ধির (বা আক্কেলের) অর্ধেক, এবং উত্তমরূপে প্রশ্ন করা জ্ঞানের অর্ধেকের সমান।

১১। নামায ও দোওয়া সম্বন্ধে :-"মেফতাহুল জান্নাতে আসসালাতু ওয়া মেফতাহুস সালাতে আততুহুর।" (আহমদ)। অর্থ :—জান্নাতের চাবী হইল নামায এবং নামাযের চাবী হইল অজু।

১২। "লা সালাতা লেমাল লাম ইয়াকরা-আ বেফাতেহাতীল কেতাব।"

অর্থ :—সুরা ফাতেহা ব্যতীত কোন নামায হয় না। (তিরমিযি)।

১৩। "বাইনাল আবদে ওয়া বাইনাল কুফরে তারকুস সালাত।" (মুসলিম)।

অর্থ :—বান্দা এবং কুফরের মধ্যে পার্থক্য শুধু নামায পরিত্যাগ করার মধ্যে নিহিত (অর্থাৎ নামায ছেড়ে দিলে মানুষ কাফের হইয়া যায়)।

১৪। "লা-ইয়ারুদ্দুল কাজায়া ইল্লাদ-দোয়ায়ু ওয়ালা ইয়াজীদু ফিল উমরে ইল্লাল বিররু।" (তিরমিযি)।

অর্থ :—দোওয়া ব্যতিত ভাগ্য পরিবর্তন করা যায় না এবং সৎকর্ম ব্যতিত আয়ু বাড়েনা।

১৫। "ছালাছু দাওয়াতেন মুসতাজাবাতুন লা শাক্কা ফিহিন্না দাওয়াতুল ওয়ালেদে ওয়া দাওয়াতুল মুসাফেরে ওয়া দাওয়াতুল মজলুম।"

অর্থ :—তিনটি দোওয়া কবুল হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ নাই—এইগুলি হইল (ক) সন্তানের জন্য পিতামাতার দোওয়া, (খ) মুসাফিরের দোয়া এবং (গ) মজলুম বা অত্যাচারিত ব্যক্তির দোয়া। (তিরমিযি)।

"আল্লাহর রজ্জুকে জামাতবদ্ধভাবে আকড়াইয়া ধর এবং বিভেদ সৃষ্টি করিও না"—আল-কোরআন

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ),
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী।
জন্ম ঃ ১৮৩৫ইং, দাবী ঃ ১৮৮৯ ইং মোতাবেক
১৩০৬ হিজরী সন।

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পবিত্র বাণীর আলোকে

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কোরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শেফায়তকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

* ইউরোপের অধিকাংশ লোক তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ইসলামে দীক্ষিত হইবে।

* সমস্ত ধর্মই ইসলামের অন্তর্ভুক্ত আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ের নিকট ম্লান হইয়া পরিণামে প্রায় অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। পৃথিবীতে তাঁহার অনুবর্তিগণের আধিপত্য স্থাপিত হইবে এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা নিতান্ত হ্রাস পাইবে ও তাহারা হীন অবস্থায় পতিত হইবে।

* সম্রাট ও রাজাগণ তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং তাঁহারই বস্ত্র হইতে আশীর্বাদ অনুসন্ধান করিবে।

* যে সকল রাজশক্তি তাঁহার সম্প্রদায়ের উন্নতি ও বিস্তারে বিঘ্ন উৎপাদন করিবে এবং তাঁহার আনুগত্য স্বীকারে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিবে তাহারা কাটা যাইবে এবং ধরাতল হইতে তাহাদের নাম মুছিয়া যাইবে।

* আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার দ্বারা সত্য, ন্যায় ও প্রেম প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং মানব ও সৃষ্টিকর্তার মধ্যে স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে।

* "নবী ও রসুলদিগকে যে ভাবে পরীক্ষা করা হইত আমাকে সেইভাবে পরীক্ষা কর, আমি দাবীর সঙ্গে বলিতেছি—এই প্রণালীতে পরীক্ষা করিলে আমাকে সত্যবাদী পাইবে।"

* "খোদার পরে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেমে আমি বিভোর।
ইহা যদি কুফর হয়, খোদার কসম আমি শক্ত কাফের॥

* "বড় হইলে ছোটকে লাঞ্ছনা দিবে না, বরং তাহাদের প্রতি সর্বদা দয়া করিবে। যদি বিদ্বান হও, তবে বিদ্যাহীনকে নিজের বিদ্যার অহংকারে অবমাননা না করিয়া তাহাকে সদুপদেশ দিবে। যদি ধনী হও, তবে আত্মাভিমানে দরিদ্রের উপর গর্ব না করিয়া তাহাদের সেবা করিবে।"

"আমার মস্তক আহমদ (সাঃ)-এর চরণ ধূলায় লুণ্ঠিত। আমার হৃদয় সদা মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্য কুরবান।" —হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃতবাণী

হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ, প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ) কর্তৃক লিখিত পুস্তকাবলী হইতে কয়েকটি উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হইল।

(১) প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাব সম্বন্ধে:

"আমি পরম শিষ্টাচার ও বিনয়ের সহিত মহামান্য মুসলিম উলামা, খ্রীষ্টান পাদ্রী এবং হিন্দু পণ্ডিতগণের নিকট এই বিজ্ঞাপন পাঠাইতেছি এবং সংবাদ দিতেছি যে চরিত্র, বিশ্বাস ও ঈমানের দুর্বলতা এবং ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করিবার জন্য আমি জগতে প্রেরিত হইয়াছি। আমি হযরত ঈসা (আঃ)-এর মর্যাদা-বিশিষ্ট হইয়া আসিয়াছি এবং এই কারণে আমি "প্রতিশ্রুত মসীহ" নামে অভিহিত হইয়াছি। কারণ আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে আমি যেন শুধু অলৌকিক নিদর্শন সমূহ এবং পবিত্র শিক্ষা দ্বারা সত্যকে জগতের বুকে প্রচার করি। আমি এই কথার ঘোর বিরোধী যে ধর্মের নামে তরবারী ব্যবহার করা হউক এবং ধর্মের জন্য আল্লাহ্‌র সৃষ্টি মানব-জাতির রক্তপাত হউক। আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে, আমার দ্বারা যথাসম্ভব এই সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি মুসলমানদের মধ্য হইতে যেন আমি উচ্ছেদ করিয়া দেই এবং তাহাদিগকে পবিত্র চরিত্র, সহিষ্ণুতা, নম্রতা, সুবিচার এবং ন্যায়-পরায়নতার দিকে আহ্বান করি। আমি মুসলমান, খ্রীষ্টান, হিন্দু এবং আর্যগণের সম্মুখে এই ঘোষণা করিতেছি যে, পৃথিবীর কেহই আমার শত্রু নহে। আমি মানব-জাতিকে সেইরূপ ভালবাসি যেরূপ এক স্নেহময়ী মাতা সন্তানকে ভালবাসে—বরং আমি উহা অপেক্ষাও বেশী ভালবাসি। আমি শুধু ঐ সমস্ত ভিত্তিহীন বিশ্বাসের শত্রু, যাহার দ্বারা সত্যের বিনাশ হয়। মানব-জাতির প্রতি সহানুভূতি করা আমার জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য। মিথ্যা, শিরক, অত্যাচার এবং প্রত্যেক কদাচার, অবিচার ও দুশ্চরিত্রতার প্রতি ঘৃণা করা হইল আমার মূল-নীতি।"

"আমাকে খোদাতা'লার পবিত্র এবং পরিষ্কার অহী দ্বারা সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে আমি তাঁহারই তরফ হইতে প্রতিশ্রুত মসীহ এবং অঙ্গীকৃত মাহদী, এবং আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক মতভেদ সমূহের মীমাংসার জন্য সুবিচারক রূপে প্রেরিত হইয়াছি। আমার জন্য মসীহ এবং মাহদী যে দুই নাম রাখা হইয়াছে—উক্ত নাম দ্বারা হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে পূর্বেই সম্মানিত করিয়াছেন। পরে খোদাতায়ালা আপন পরিষ্কার বাণী দ্বারা আমার এই নামই রাখিয়াছেন। যুগের বর্তমান অবস্থাও অনুমোদন করিতেছে যে, আমার এই নামই হউক।"

[হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) প্রণীত "আরবায়ীন" নামক পুস্তক, প্রকাশ কাল ১৯০০ঈসাব্দ]

স্মরণিকা/১৯৭৯

সুনিশ্চিত সাফল্য সম্বন্ধে :

"আমি জানি খোদাতায়ালা আমার সংগে আছেন। যদি আমি পিষ্ট হইয়া যাই এবং পদদলিত হইয়া যাই এবং এক অণুর চেয়ে ক্ষুদ্রতর হইয়া যাই এবং চতুর্দিক হইতে দুঃখ, কটুবাক্য এবং অভিশাপ বর্ষিত হইতে দেখি—তবুও আমি জয়ী হইব। যিনি আমার সঙ্গে আছেন, তিনি ব্যতীত আমাকে কেহ জানে না। আমি আদৌ বিনষ্ট হইব না। শত্রুর সকল প্রচেষ্টা নিরর্থক এবং বিদ্বেষ পোষণকারীদের সকল অভিসন্ধি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। হে অজ্ঞ এবং অন্ধগণ! আমার পূর্বে কি কোন সত্যবাদী ধ্বংস হইয়াছে যে, আমি ধ্বংস হইব? কোন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আল্লাহতালা কি কখনও অপমানের সহিত বিনাশ করিয়াছেন যে, আমাকেও তিনি বিনাশ করিবেন? নিশ্চয়ই স্মরণ রাখিও এবং কান পাতিয়া শ্রবণ কর যে, আমার আত্মা বিনাশ হইবার নহে এবং আমার প্রকৃতিতে অকৃতকার্যতার বীজ নাই।"

['আনোয়ারুল ইসলাম' পুস্তক]।

ধর্মীয় 'আকিদা' সম্বন্ধে :

"আমি আল্লাহর নামে কসম করিয়া বলিতেছি যে, আমি অবিশ্বাসী নহি, আমি কলেমা 'সাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'—এর প্রতি ঈমান রাখি এবং আয়াত 'ওয়ালাকির রাসুলাল্লাহে ওয়া খাতামান নাবীয়ীন' মোতাবেক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপরে পূর্ণ ঈমান রাখি। আমি আল্লাহতালার সকল পবিত্র গুণাবলীর উপরে ঈমান রাখি এবং কুরআন করীমের প্রতিটি হরফের উপরে ঈমান রাখি এবং মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক হাসেলকৃত সকল কামালিয়াতের উপরে ঈমান রাখি।" ("কেরামাতুস সাদেকীন'-পৃষ্ঠা-২৫)

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত উহাই আমার আকীদা বা ধর্ম বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মাবুদ বা উপাস্য নাই এবং সাইয়েদনা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া।" ('আইয়ামুস সুলেহ'-পৃষ্ঠা-৮৬)

"আরটিকো" এডভারটাইজার
আপনাদের দোয়া ও শুভেচ্ছা প্রার্থী
কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও স্পে্ পেইন্টার
এফ/৩৬, মহাখালী, ঢাকা ১২

"আমার সমস্ত ধন-সম্পত্তি যদি ধর্ম প্রচারে ব্যয়িত হয়,
তবে আমি কৃতার্থ হবো।" -হযরত খলিফাতুল মসীহ আউয়াল (রাঃ)

হযরত মৌলানা আলহাজ্ব হাকিম নুরুদ্দীন, খলিফাতুল মসীহ আওয়াল (রাঃ। জন্ম: ১৮১৪ ইং। খেলাফত কাল: ১৯০৮—১৯১৪ইং

"আজ কেহ কি একথা চিন্তা করতে পারে যে, খ্রীষ্টধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং সারা পৃথিবীতে ইসলাম বিজয় লাভ করবে? তোমরা নিশ্চয় তোমাদের সামর্থ দ্বারা এই মহানকার্য করতে সক্ষম হবেই। উপরন্তু আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে। তোমাদের যা অবশ্যকরণীয় তা হ'লো—সাহস এবং সংকল্পের সাথে ইসলামের খেদমত করা।"

হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ। জন্ম ঃ ১২ জানুয়ারী ১৮৮৯ইং। মৃত্যু ঃ ৮ই নভেম্বর ১৯৬৫ ইং। খেলাফত ঃ ১৯১৪—১৯৬৫

সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর পয়গাম

'স্মরণিকা' উপলক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর নিকট হইতে বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্দেশ্যে নায়েব সদর খলিলুর রহমান সাহেবের নামে প্রেরিত বাণী নিম্নে বঙ্গানুবাদ সহ দেওয়া হইল :

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلى على رسوله الكريم

Rabwah
Dated 13.8.1979.

My dear Mr. Khalilur Rahman,

Assalamo Alaikum.

I am happy to know that Majalis Khuddamul Ahmaddiya Bangladesh are publishing a 'souvenir' on the occasion of their 8th Annual Ijtema. I pray to Allah to make the publication of the sovenir a success. You have asked for a message on this occassion. My message to you is :

Make Islam the be all and the end all of your existence. Try to attain to Allah's love and by becoming intoxicated in the love of Muhammad, peace & blessings of Allah be upon him, and by following him, become a good model for the people of this world. May Allah be with you all and help you in serving the cause of Islam and Ahmadiyyat.

Yours Sincerely
Mirza Nasir Ahmed
Khalifatul Masih

* * *

বাংলা তরজমা :

প্রিয় খলিলুর রহমান,

রাবওয়া, তাং ১৩/৮/৭৯

আস্‌সালামো আলায়কুম।

জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া তাহাদের ৮ম বার্ষিক ইজতেমা উপলক্ষ্যে একটি 'স্মরণিকা' প্রকাশ করিতেছে। এই 'স্মরণিকা' প্রকাশ যাহাতে সুসম্পন্ন এবং ফলপ্রসূ হয় তজ্জন্য আমি আল্লাহতায়ালার নিকট দোয়া করি। এতদুপলক্ষে আপনি একটি পয়গাম চহিয়াছেন। আপনাদের প্রতি আমার পয়গাম এই :

"ইসলামকে আপনাদের জীবনে 'সবকিছু' এবং সর্বময় উদ্দেশ্যে পরিণত করুন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেমে বিভোর হইয়া আল্লাহতায়ালার ভালবাসা অর্জনে চেষ্টিত হউন এবং তাঁহাকে অনুসরণের মাধ্যমে বর্ত্তমান বিশ্বের মানুষের কাছে নিজেকে আদর্শরূপে পেশ করুন। আল্লাহ্ আপনাদের সকলের সহায় হউন এবং ইসলাম ও আহ্‌মদীয়াতের সেবায় আপনাদিগকে সাহায্য করুন।"

আন্তরিকভাবে আপনাদের
মির্জা নাসের আহমদ
খলিফাতুল মসীহ্

হযরত মীর্যা নাসের আহমদ, খলিফাতুল মসিহ সালেস (আই:)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বর্তমানে আহমদীয়া জামাতের নির্বাচিত খলিফা হযরত মীর্যা নাসের আহমদ ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি পবিত্র কুরআন শরীফ মুখস্থ করেন এবং 'হাফেজ-ই-কুরআন' হওয়ার গৌরব লাভ করেন। শিক্ষাজীবনে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবীতে অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন এবং পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এ, ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৫ সালে আহমদী জামাতের তৃতীয় খলীফা হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে তিনি আহমদীয়া জামাতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি কুড়ি (২০) বছরেরও অধিক কাল জামাতের কেন্দ্রীয় শিক্ষা, প্রতিষ্ঠান তথা তালিমুল ইসলাম কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই কলেজটির বিশাল 'কমপ্লেক্স' সম্পর্কিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাঁর মহা অবদান রয়েছে। এছাড়াও তিনি আহমদীয়া আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ তথা সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট পদে বহু বছর ধরে কাজ করেছেন। এতদ্ব্যতীত কেন্দ্রীয় মজলিশ খোদ্দামুল আহ্-মদীয়া এবং মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র সদর (প্রধান) হিসাবেও তিনি জামাতে বিশেষ অবদান রাখেন। ১৯৬৫ সালে খলিফা হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে তাঁর প্রগতিশীল নেতৃত্বের ফলে জামাত বিভিন্ন দিক দিয়ে আশ্চর্যজনকভাবে উন্নতি করে যাচ্ছে। এই মহান আধ্যাত্মিক আন্দোলনের কেন্দ্রের সকল কাজ-কর্ম এবং পৃথিবীব্যাপী আহমদীয়া প্রচার তৎপরতা, তালিম ও তরবীয়তের কার্যাবলী অত্যন্ত আন্তরিকতা এবং অদম্য স্পৃহার সঙ্গে তিনি পরিচালনা করে যাচ্ছেন। অনেকগুলো নতুন নতুন মিশন, মসজিদ, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা-কেন্দ্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং এই কাজগুলি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি লাভ করছে। তাঁর নির্দেশে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে নতুন নতুন স্কীম অনুযায়ী ইসলাম প্রচার এবং প্রতিষ্ঠার বিশ্বব্যাপী মহা অভিযান দ্রুতগতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামাতের মহান নেতা হিসাবে বহুবার তিনি বহির্দেশ ভ্রমণ করেছেন। বিশেষতঃ ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশে সফর করেন এবং এই সকল সফরের ফলে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে অবস্থিত জামাত সমূহে নতুন জাগরণের সাড়া পড়েছে। তিনি বিশ্ববাসীকে তাদের সমস্যাবলীর খোদা-প্রদত্ত সমাধান হিসেবে প্রকৃত ইস-লামী শিক্ষা কি তা সুস্পষ্টরূপে পেশ করেছেন। তাঁর নেতৃত্বাধীনে ১৯৭৮ সালের জুন মাসে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত 'কাসরে সলীব কনফারেন্সে' তিনি সমাপ্তি ভাষণ দান করেন এবং বিশ্বব্যাপী খ্রীষ্টান চার্চকে তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বিশ্বের সকল বড় বড় শহরে আয়োজিত আলোচনা সভায় তাদেরকে যোগদান ও মুকাবেলার জন্য আহ্বান জানান। চার্চ এপর্যন্ত নিরুত্তর থেকে সম্পূর্ণ অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর প্রতিশ্রুত পৌত্র

সাইয়েদনা হযরত হাফিজ মীর্জা নাসের আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ);

জন্ম ঃ ১৭ই নভেম্বর ১৯০৯ ইং। খেলাফতকাল ঃ ১৯৬৫ হইতে বর্তমান সময়।

রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত ১৯৭৯ সালের কেন্দ্রীয় সালনা জলসায়
বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সহিত হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, "রাবওয়া" সর্বোত্তম হওয়ার ফলে ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৭৯ হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) "খেলাফত জুবলী" ঝাণ্ডা দিচ্ছেন জনাব মাহমুদ আহমদের হাতে।

মোহতারম জনাব আমীর সাহেবের পয়গাম

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে 'স্মরণিকা' নামে একটি বার্ষিকী প্রকাশ হইতেছে জানিতে পারিয়া আমি এই প্রচেষ্টাকে মোবারকবাদ জানাইতেছি এবং ইহার সর্বাঙ্গীন কমিয়াবীর জন্য দোওয়া করিতেছি। ইতিপূর্বে যে 'স্মরণিকা' প্রকাশিত হইয়াছিল বর্তমান সংখ্যাটি তদ-অপেক্ষা অধিকতর তথ্যবহুল হইয়াছে। বিশেষভাবে খোদ্দাম ও আতফালের জন্য এবং সাধারণভাবে সকলের জন্যই এই স্মরণিকার বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষামুলক এবং জ্ঞানগর্ভ বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সকল বিষয় তালিম ও তবলিগের ক্ষেত্রে খোদ্দাম ও আতফালদিগকে অনেক দিকদিয়া সাহায্য করিবে এবং প্রকৃত ইসলাম তথা আহমদীয়াতের খেদমতের জন্য তাহাদিগকে আরও বেশী অনুপ্রাণীত করিবে ইহাই কামনা করি।

আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের সকলকে দ্বীনে-ইসলামের সত্যিকার খেদমত করার তৌফিক দান করুন এবং ইসলামী তৌহিদের ছায়াতলে বিশ্ববাসীকে শীঘ্র একত্রীভূত করুন (আমীন)।

মোহাম্মদ

আমীর বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

কেন্দ্রীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার

মোহতারম সদর সাহেবের পয়গাম

বাংলাদেশ মজলিশ খোদ্দামুল আহমদীয়ার "স্মরণিকা" প্রকাশের সংবাদ জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি। খোদ্দামদের মধ্যে কর্ম প্রেরণা ও লিখনী শক্তি বাড়ানোর জন্য নিঃসন্দেহে ইহা একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। বিশ্ব-মানবকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্যও তাহাদিগকে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত করে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক পুনরায় সুদৃঢ়ভাবে কায়েম করার উদ্দেশ্যে আল্লাহতায়ালা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে পাঠিয়েছেন।

এবাদত ও খেদমতে খালক আমাদের লক্ষ্য। এই মহান উদ্দেশ্য ও গুরু দায়ীত্ব সফলতার সাথে সু-সম্পন্ন করার জন্য আপনারা সদা সচেষ্ট থাকবেন বলে আমি আশা রাখি। আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদের হাফেজ ও নাসের হউন। ইতি— *মাহমুদ আহমদ*,

সদর

তাং ২২/১১/৭৯ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া মরকজিয়া রাবওয়া।

খোদ্দামের আহাদনামা ঃ

আশহাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শরীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।

ম্যাঁয় একরার করতাহুঁ কে দ্বীনী, কওমী আওর মিল্লী মফাদ কি খাতের ম্যাঁয় আপনি জান, মাল ওয়াক্‌ত আওর ইজ্জত কো কোরবান করনেকে লিয়ে হরদম তৈয়ার রহুঙ্গা ; ইসি তারাহ্‌ খেলাফতে আহমদীয়া কে কায়েম রাখনে কি খাতের হার কোরবানী কে লীয়ে তাইয়ার রহুঙ্গা আওর খলিফায়ে-ওয়াক্‌ত জো ভী মা'রুফ ফয়সালা ফরমায়েঙ্গে উসকী পাবন্দী করনি জরুরী সমঝুঙ্গা (৩ বার) ইনশাআল্লাহতায়ালা।

অর্থ ঃ—আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্‌তায়ালা ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার দাস এবং রসুল।

আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ধর্মীয়, জাতীয় এবং দেশের স্বার্থ রক্ষার্থে নিজ প্রাণ, ধন, সময় এবং মান-সম্ভ্রম কুরবানী করিতে সদা প্রস্তুত থাকিব। তদ্রুপ আহমদীয়া খেলাফতকে অক্ষুন্ন রাখিতে সর্ব প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকিব এবং যুগ-খলিফা যে মা'রুফ (ন্যায়) মীমাংসা প্রদান করিবেন, তাহা পালন করাকে অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিব।

আতফালের আহাদনামা ঃ

আশহাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শরীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।

ম্যায় ওয়াদা কারতাহুঁ কে দ্বীনে-ইসলাম আওর আহমদীয়াত, কওম আওর ওয়াতান কি খেদমত কে লিয়ে হরদম তৈয়ার রহুঙ্গা। হামেশা সাচ বলুঙ্গা, আওর খলিফাতুল মসীহ কে তামাম হুকমোঁ পর আমল করনে কি কোশেশ করুঙ্গা। (৩ বার) ইনশা আল্লাহতায়ালা।

অর্থ ঃ—আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহতায়ালা ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার দাস এবং রসুল।

আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ইসলাম এবং আহমদীয়াত, দেশ এবং জাতির খেদমত করিবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকিব। সদা সত্য কথা বলিব এবং খলিফাতুল মসিহ (আইঃ)-এর সকল আদেশ পালন করিবার জন্য প্রচেষ্টা চালাইব।

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় ইজতেমায় ভাষণ দিচ্ছেন জনাব মাহমুদ আহমদ সাহেব (বর্তমানে সদর মজলিস)

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৮ম বার্ষিক ইজতেমা (

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার মজলিসে আমেলার সদস্যবৃন্দ (মধ্যে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার শ্রদ্ধেয় আমীর মোহতারম মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব উপবিষ্ট রয়েছেন)। বিভাগীয় ও জিলা কায়েদগণকেও দেখা যাচ্ছে।

ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলনের পটভূমি

মৌলবী মোহাম্মাদ, (আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া)

বিশ্বব্যাপী ইসলামের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ণ-প্রচারকল্পে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং অন্যান্য বহু গ্রন্থে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আবির্ভূত হন 'ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ' রূপে। হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ১৮৩৫ ইসাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শুক্রবার প্রভাতে পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জিলার অন্তর্গত বাটালা মহকুমার কাদিয়ান নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ মীর্যা হাদী বেগ পারশ্য রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বাদশাহ বাবরের রাজত্বকালে সমরকন্দ থেকে হিজরত করে যে স্থানে বসবাস করেন, তাহাই উত্তরকালে কাদিয়ান নামে পরিচিত হয়। তিনি বাদশাহের দরবার হতে বিস্তীর্ণ জমিদারী প্রাপ্ত হন। ৮৫টি গ্রাম ঐ জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ১৮৮৯ ঈসাব্দে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হতে জ্ঞাত হয়ে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী হওয়ার ঘোষণা করেন এবং ১৮৯১ ঈসাব্দে মসীহ্ মওউদ বা প্রতিশ্রুত ঈসা হওয়ার দাবী করেন। তাঁহার দাবীর সত্যতার স্বপক্ষে তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদীস হতে এবং বাইবেল, (তৌরাত, ইঞ্জিল) ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ হতে অকাট্য প্রমাণ পেশ করেন এবং সেইসঙ্গে অসংখ্য জলন্ত ঐশী নিদর্শন প্রদান করেন। সময়ের প্রয়োজনীয়ত, তাঁর আবির্ভাবের সত্যতার নিদর্শন প্রদান করেছে। তাঁর পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবন, তাঁর জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ সাহায্য, তাঁর ঐশী জ্ঞান, তাঁর কবুলিয়তে-দোওয়া, তাঁর কার্যাবলী, তাঁর সংগঠন এবং রূহানী নেতৃত্ব, তাঁর শত্রুগণের পরিণাম, তাঁর ভবিষ্যদ্বানী সমূহের যথাসময়ে পূর্ণতা লাভ ইত্যাদি বিষয়ে হাজার হাজার প্রমাণ তাঁর ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবীকে মোহরাঙ্কিত করেছে।

আরবী, ফার্সী এবং উর্দু ভাষায় তিনি ছোট-বড় প্রায় ৯০ খানা পুস্তক প্রণয়ণ ও প্রকাশ করেন। এই সকল পুস্তকের পাতায় পাতায় ছত্রে ছত্রে আল্লাহ্‌তা'লা এবং ইসলাম, পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র রসুল হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম প্রেম ও ভালবাসা এবং সেইসঙ্গে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শকে বিশ্বব্যাপী পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ প্রচারের জন্য যুক্তি-প্রমাণ সম্বলিত শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি ও কার্যকরী ব্যবস্থার রূপরেখা বর্ণিত রয়েছে। এই সকল বই-পুস্তক ছাড়াও তিনি জীবনে ৯০ হাজার চিঠি-পত্র লিখেন এবং পৃথিবীর রাজন্যবর্গ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট তাঁকে গ্রহণ করার জন্য নবীগণের সুন্নত অনুযায়ী দাওয়াতী পত্রও লিখেন। এই সকল চিঠির সংখ্যা ১৬ হাজার।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব কালে ইসলাম ধর্মকে তিনি একটি দুর্বল, জর্জরিত এবং অসহায় অবস্থায় দেখতে পান। ইসলাম ধর্মের উপর বাহ্যিক প্রবল বহিরাক্রমণ এসেছিল এবং আভ্যন্তরীণভাবে নানা দুর্বলতা এবং কুসংস্কার দেখা দিয়েছিল। ইসলামের উপর প্রকাশ্য বহিরাক্রমণ বিশেষতঃ খ্রীষ্টানগণ কিরূপ সাংঘাতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য তা নিম্নের একটি উদ্ধৃতি হতে সহজেই বুঝা যাবে :

"I might sketch Christian movement in Mussalman lands which has touched, with the radiance of the cross the Lebanon and the Persian mountains, as well as the waters of the Bosphorus and which is the sure harbinger of the day when Cairo and Damascus and Teheran shall be the servants of Jesus and when even the solitudes of Arabia shall be pierced and Christ in the person of His disciples shall enter the Kaba of Mecca and the whole truth shall at last be there spoken."
[Lectures on 'Christianity—The world wide Religion,' 1896-97 by John Henry Burrows, Page—42]

আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে ইসলামের অবস্থা এই যে, প্রকৃত তৌহীদের স্থলে অসংখ্য প্রকারের শেরেক ও বেদাতের সৃষ্টি হয়েছিল এবং পূণ্য কাজের স্থলে কতকগুলো সামাজিক কুপ্রথা মাত্র বিরাজ করছিল। পীর-পূজা, কবর-পূজা এতদূর পৌঁছেছিল যে উহাকে একটা নতুন শরীয়ত বলা যেতে পারে। সত্যিকার তাকওয়া ও তাহারত ছিল ইসলামের মূল লক্ষ্য, কিন্তু কালক্রমে এগুলির অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে মদ খাওয়া, পরের সম্পত্তি হরণ, পর্দাহীনতা, চরিত্রহীনতা, অনাচার, শঠতা ইত্যাদি আলোচনা করলে একখানা বৃহৎ পুস্তক লেখা যাবে। কালক্রমে মুসলমানগণ ৭৩ ফেরকার বিভক্ত হয়ে পড়েন এবং উহারও নানা উপশাখা-প্রশাখা রয়েছে। এই সব ফিরকার মধ্যে শত শত পীর ও তাহাদের গদ্দীনশীন উত্তর-পুরুষগণ এবং অন্যান্য দল-নেতাগণ উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে শতধাবিভক্ত করে কুফুরী ফতোয়ার তবরারী দিয়ে একদল অন্য দলকে কাফের সাব্যস্ত করতে এগিয়ে এলো। বলা বাহুল্য যে ইসলামী খেলাফতের চির প্রতিশ্রুত রজ্জু হতে পর্যায়ক্রমে স্খলিত হওয়ার ফলে মুসলীম ঐক্য এবং সংহতি নষ্ট হয়ে যায়। এমন একদিন ছিল যখন সকল জাতি ইসলামের মহান শিক্ষা ও মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ববোধ ও আদর্শে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতো। কিন্তু খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তথা হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইসলামের উপর এমন এক অমানিশা নেমে এসেছিল, যখন অধিকাংশ মুসলমান দেশ রাজ্য-হারা, স্বাধীনতাহারা পরাধীন জীবন যাপন করছিল—অন্যদিকে অসংখ্য

মুসলমান বিজাতীয় প্রচার তৎপরতার এবং অন্যান্য প্রলোভনের অসহায় শিকারে পরিণত হয়। অনেকে নিরাশ হয়ে নাস্তিকে পরিণত হলো অথবা খৃষ্টান ও শুদ্ধি আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু-ধর্ম গ্রহণ করলো। ঐ সময় প্রায় ১৩ লক্ষ মুসলমান খৃষ্টান হয়ে যায়—তাদের মধ্যে খৃষ্টান সিরাজুদ্দীন, এনায়তুল্লীন, সফর আলী, শায়েক প্রমুখ আলেমগণও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা খৃষ্টানধর্ম শুধু গ্রহণই করেন নাই—ইসলাম-বিরোধী প্রচার কার্যেও আত্মনিয়োগ করেছেন। অন্যান্য আলেমগণ নির্বিকার চিত্তে এই দৃশ্য দেখে 'তারা কাফের হয়ে গেছে' বলে আপন কর্তব্য কর্ম সমাপ্ত করলেন।

এই সকল অবস্থার প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেছেন: "এই সকল দুরাবস্থা যখন দেখি বা শুনি, অন্যের কথা বলিতে পারি না, আমার মনে বড় আঘাত লাগে। আজ ইসলাম এমন দুরাবস্থায় নিপতিত হইয়াছে এবং মুসলমান সন্তানদের অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা ইসলামকে তাহাদের রুচী-বিরুদ্ধ মনে করিতেছে। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা ইসলামী বিধি-নিষেধের বাহিরে যাইয়া হালালকে হারাম করে নাই বটে; কিন্তু খ্রীষ্টান চাল-চলন অধিকতর ভালবাসে। তাহারা খ্রীষ্টান ধর্মের দিকে এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছে।"

[হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) প্রণীত "তবলীগে হক" পৃষ্ঠা—৯]।

ইসলামের ভিতরের অবস্থা এবং ইসলামের বাহিরের শত্রুদের প্রচণ্ড আক্রমণ সত্বেও ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ী প্রতিশ্রুতি কি অপূর্ণ থেকে যেতে পারে? আপাতঃদৃষ্টিতে উদ্ধারের কোন পথ দেখা যাচ্ছিল না। আভ্যন্তরীণ কলহ-কোন্দলে, বাহ্যিক শত্রুদের আক্রমণে, নাস্তিকতার গরল নিশ্বাসে বস্তুবাদী মতবাদগুলোর নির্মম নিষ্পেষণে যখন পৃথিবীতে এক মহা-অমানিশার কালছায়া নেমে এসেছিল, যখন দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের অশুভ শক্তি ও প্রতিপত্তি মহা-ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করে যাচ্ছিল, যখন 'মুসলমান দর গোর, মুসলমানী দর কেতাব' অর্থাৎ 'যারা সত্যিকার মুসলমান ছিল তাঁরা কবরে চলে গেছেন এবং সত্যিকার মুসলমানিত্ব ছিল কেতাবে লিপিবদ্ধ' এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, যখন 'ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলি অবশিষ্ট ছিল', সেই সময়ে—সেই মহা-প্রতিশ্রুত সময়ে—আল্লাহ্তা'লা মুহাম্মদী উম্মতের বাহির হতে নয়, বরং মুহাম্মদী উম্মতের মধ্য হতেই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও মসীহ (আঃ)-কে প্রেরণ করেছেন। তিনি আল্লাহ্তা'লার নির্দেশে ইসলামের পুন'-প্রচার কল্পে একটি শক্তিশালী সংগঠন তৈরী করলেন এবং তাঁর কথা, কাজ-কর্ম, লেখনী এবং ঐশী নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে ইসলামের সত্যতার জলন্ত ও জীবন্ত সাক্ষ্য প্রদান করলেন। তিনি বজ্র নিনাদে ঘোষণা করলেন যে, 'সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে কাল-ক্রমে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পর যেমন পুনরায় সে মাতৃগর্ভে ফিরে যেতে পারে না', তেমনিভাবে প্রগতির ধারায় ধর্ম ইসলামের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে আবার খ্রীষ্ট-ধর্মে

ফিরে যাবে না—যীশু-খ্রীষ্ট স্বয়ং অথবা খ্রীষ্টধর্মের কোন ব্যক্তি এসে ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং পূর্ণ-প্রচার করতে পারবে না।' তিনি ঘোষণা করলেন: 'ইসলাম ধর্মই জগতে বিজয়ী হবে—ইহা আল্লাহতা'লার বিধান।' এই মহান বাণীই তিনি এনেছেন এবং ইহার জন্য যথাযথ ব্যবস্থাপনা করাই তাঁর কাজ। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেছেন:

"ওয়াক্ত থা ওয়াক্তে মসীহা,
না আওর কেসি কা ওয়াক্ত
ম্যাঁয় না আতা তো আওর হি
আয়া হোতা।"

অর্থ: "ইহাই প্রতিশ্রুত মসীহের যমান', অন্য কাহারও যমানা নয়:
যদি আমি না আসিতাম তবে অন্য কেহ নিশ্চয়ই আসিত।"

অজানা অচেনা একটি স্থান হতে সহায়-সম্বলহীন একব্যক্তি হিসেবে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি একটি দুর্বল কলম নিয়ে বিভিন্ন ধর্মের শক্তিশালী দুর্মুখ পণ্ডিত, পুরোহিত ও ধর্মযাজকগণের বিরুদ্ধে ইসলামের বিশ্বজয়ী ঘোষণাসহ দণ্ডায়মান হলেন। তাঁর লেখনীর আঁচড়ে আঁচড়ে জ্ঞান, যুক্তি ও শক্তির অপূর্ব ঝলক উদ্ভাসিত হলো। তিনি উম্মী স্বরূপ ছিলেন, কিন্তু তাঁর বাক্য ও লেখনীর সম্মুখে সকলে নির্বাক হয়ে গেল। ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের কলম শুষ্ক ও কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। মুসলমানদের ধর্মত্যাগী হওয়ার স্রোত থেমে গেল। সত্যান্বেষীর চোখে সত্যের জ্যোতিঃ নেমে এলো এবং হৃদয়ে ঈমানের প্রবাহ উৎসারিত হলো। মুসলমান তার হরানো ঈমান ও আমল ফিরে পেলো এবং বহু অমুসলমান আবার মুসলমান হতে লাগলো।

হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ প্রবল যুক্তি ও নিদর্শনাবলী দ্বারা খণ্ডন করলেন এবং ইসলাম ও হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সত্যতাকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি ইসলামের সক্রিয় খেলাফতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন এবং কার্যকরী কর্মপন্থা সম্বলিত সৎকর্মশীলদের একটি জামাত গঠন করে ইসলামের মহা-প্রতিশ্রুত বিজয়ের পথ উন্মুক্ত করে দিলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবে আল্লাহতা'লার বিশেষ অনুগ্রহ ও আশীষ-মণ্ডিত ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ-প্রচারের এক মহা-কার্যক্রম শান্তিপূর্ণভাবে সাফল্যের পর সাফল্য অর্জন করে সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলেছে। পাশ্চাত্যবাসী, যারা আমাদের ঘরে এসে আমাদের মানুষকে বিপথগামী করতেছিল—আজ তাদের মোকাবেলায় আহমদী মুবাল্লিগগণ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে প্রত্যেকের ঘরে ইসলামের আশীষধারা বন্টন কার্যে নিমগ্ন রয়েছেন। প্রত্যেক আহমদী আজ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ—ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সম্মানকে জীবনের বিনিময়েও সতর্ক

প্রহরীর ন্যায় সংরক্ষণ করতে হবে। সে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে বিশ্ব-নবী রূপে এবং সারা বিশ্বকে তাঁর রহমতের ছায়াতলে এক মণ্ডলীভুক্ত করার মহান আদর্শ ও বাস্তব কর্ম-প্রচেষ্টার মহা-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ এবং সদা প্রস্তুত। আহমদীয়া জামাত শান্তি ও যুক্তিপূর্ণ পথে ও পদ্ধতিতে যে বাস্তব কর্ম-প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তারই মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে ইসলামের প্রতিশ্রুত বিজয় মানুষের হৃদয়ে, মানুষের ধ্যান-ধারণা ও জীবন যাপনের ক্ষেত্রে পরীক্ষিত সত্য বলে প্রমাণিত হবে এবং তার ফলে ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অল্প সময়ের মধ্যে ইসলাম সমস্ত জগতকে ছেয়ে ফেলবে।

ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ রূপে হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) যে সকল কাজ করেছেন তা নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো :—

(১) হযরত রসুল করীম (সাঃ) যে ইসলাম রেখে গিয়েছেন, তিনি জগতের সামনে সেই ইসলামকে উপস্থাপিত করেছেন, অর্থাৎ কুরআনের ইসলাম যা মানুষের প্রকৃতিগত ধর্ম, যে ইসলাম দ্বারা এই দুনিয়াতে এবং এই জীবনেই খোদাতায়ালাকে লাভ করা যায় এবং যে ইসলাম দ্বারা ব্যক্তি এবং জাতি হিসাবে সঠিক অর্থে সাংসারিক ও আত্মিক উভয় প্রকার উন্নতি লাভ করা যায়। তিনি অকাট্য প্রমাণ এবং ঐশী নিদর্শন সমূহের দ্বারা ইসলামের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

(২) বর্তমান মুসলমানদের ধর্ম-বিশ্বাসের বা আকায়েদের মধ্যে যে সব গলদ প্রবেশ করেছে তিনি সেগুলির সংস্কার সাধন করেছেন এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন।

(৩) ইসলামের প্রতি বহিরাক্রমণ হতে তিনি ইসলামকে রক্ষা করেছেন। নাস্তিক, হিন্দু, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম ইত্যাদি নানাদিক হতে ইসলামের উপর যে সব আক্রমণ চলছিল তিনি সেগুলি হতে ইসলামকে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ, ঐশী নিদর্শনাবলীর দ্বারা প্রতিহত করেন। বিশেষ করে প্রচলিত ত্রিত্ববাদী খৃষ্ট-ধর্ম এবং হিন্দুধর্মে যে সব ভুল বিশ্বাস রয়েছে তিনি সেগুলি দেখিয়ে দিয়েছেন।

(৪) তাঁর মাধ্যমে ইসলামে খেলাফত ব্যবস্থা পুণঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তিনি এমন একটি জামাত রেখে গিয়েছেন যে জামাত তাঁর দৃষ্টান্ত ও শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পৃথিবীব্যাপী পুনোদ্যমে ইসলাম প্রচার কার্য পরিচালনা করছে।

হে ভাই মুসলমান! বিশ্বব্যাপী ইসলামী বিজয়াভিযানের কাজ তো আপনার অতি প্রিয় কাজ। আলেমগণ আপোসে কুফরের ফতোয়া বিনিময় করে সকল মুসলমানের কপালে অজানিতে কুফরের টিকা অঙ্কন করে তাহাদেক নিষ্ক্রিয় করে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছিলেন। উলেমা এবং সাধারণ সকল মুসলমানকে আল্লাহর তরফ হতে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) প্রেমের ডাক দিয়ে ঈমান ও আমলের জ্যোতির্ময় ভূষণে ভূষিত করে নব জীবনের অভিষেক দিতে আমন্ত্রণ করেছেন। সেই নব জীবন ও জ্যোতিঃ লাভ করে সকলকে আজ ইসলামের বিশ্ব-বিজয় অভিযানে অগ্রগামী হতে হবে। আসুন, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর হাতে

সেই আশিস গ্রহণ করুন। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর আগমনের পর বহু সময় অকাজে নষ্ট হয়েছে। চলুন, আমাদের অতীত ত্রুটি পূরণের জন্য হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে জগতে বিশ্ব-নবীরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে আমরা সকলে এক লক্ষ্যে হাতে হাত মিলিয়ে কাজে নামি। আল্লাহতায়ালা আমাদের সহায়। বিজয় অবশ্যই হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর জন্য নির্ধারিত। হযরত ইমাম মাহদী মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বলেনঃ

"আজ সেই দিন আগত প্রায় যখন সত্যের দেদীপ্যমান সূর্য পশ্চিম হইতে উদিত হইবে এবং ইউরোপবাসী সত্য খোদার সন্ধান লাভ করিবে।.....সেই দিন নিকটবর্তী যখন ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্ম লোপ পাইবে এবং সকল প্রচেষ্টা ও যুক্তি ব্যর্থ হইবে, কিন্তু ইসলামের ঐশী অস্ত্র ততদিন পর্যন্ত না ভগ্ন হইবে, না তীক্ষ্ণতা হারাইবে, যতদিন পর্যন্ত না উহা দাজ্জালী শক্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিবে। খোদাতায়ালার সেই খাঁটি তৌহিদ যাহা মরুপ্রান্তের অধিবাসীগণ এবং যাহারা সর্বপ্রকার জ্ঞানালোক হইতে বঞ্চিত তাহারাও নিজ অন্তরে উপলব্ধি করে, অচিরেই তাহা সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। সে দিন না কোন কল্পিত প্রায়শ্চিত্তের অস্তিত্ব থাকিবে, না কোন কল্পিত খোদার। খোদাতায়ালার একটি আঘাত কুফরের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিবে। কিন্তু তাহা না কোন তরবারীর সাহায্যে, না কোন বন্দুকের দ্বারা, বরং উহা সত্যানুসন্ধিৎসু আত্মাদিগকে আলোক দান করিয়া। আমি যাহা বলিতেছি, তখন তোমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে।" (তাযকেরা, ২৯৯ পৃঃ)।

আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি সকল মুসলমান ভাইকে সুমতি দেন। তিনি হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মারফত যে মহা-সুসংবাদ দিয়েছেন, তা অচিরেই পূর্ণ হউক এবং সারা বিশ্বের জনগণ ইসলামের শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করে ধন্য হোক। আমিন। সকল প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য।

"আহমদ ফার্নিচার"

আধুনিক আসবাবপত্র প্রস্তুতকারক
ও সরবরাহকারী

গুপ্ত পাড়া, স্টেশন রোড, রংপুর

'স্মরণিকা ১৯৭৯'
প্রকাশ লগ্নে আপনাদের দোওয়া
ও শুভেচ্ছা প্রার্থী

১৯৭০ সালে হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) পশ্চিম আফ্রিকার ছয়টি দেশ সফর করেন। সফরের কয়েকটি ছবি।

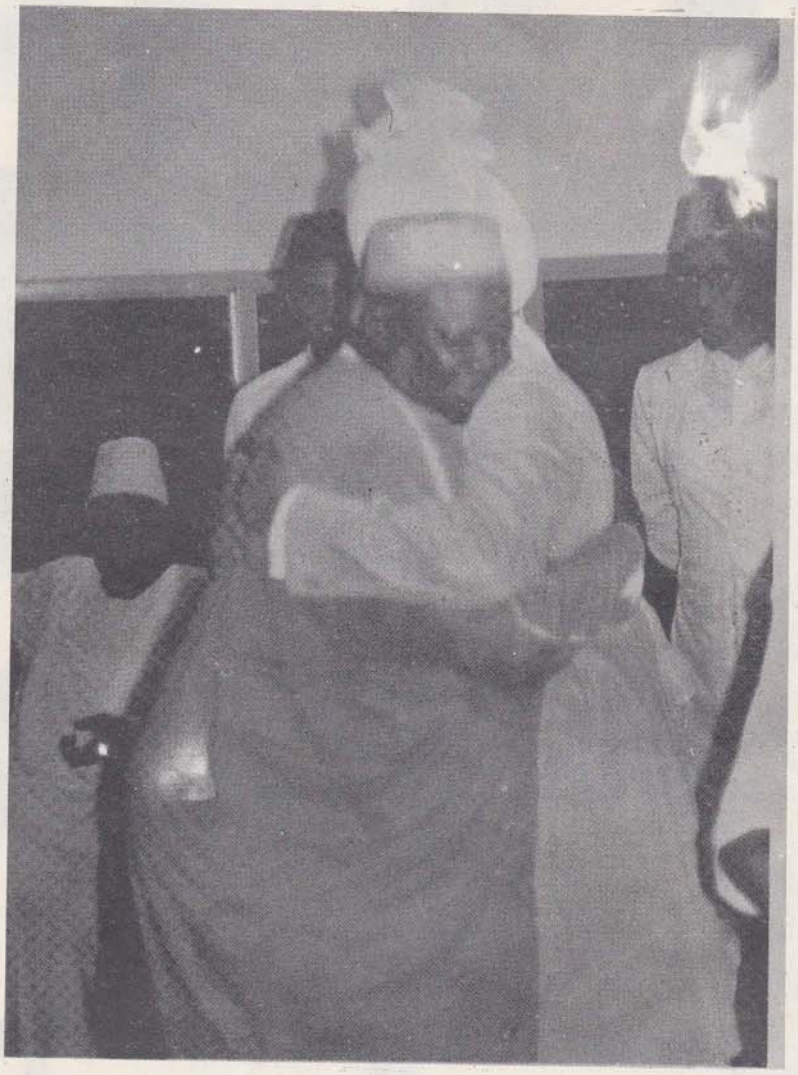

আফ্রিকা সফরের একটি দৃশ্য (১৯৭০ খৃঃ)। স্থান—গাম্বিয়া।

The Head of the Ahmadiyya Community meets the Gambian President, Sir Daud Jawara.

Alhaj Sir F. M. Singhateh held a Reception at the Atlantic Hotel.

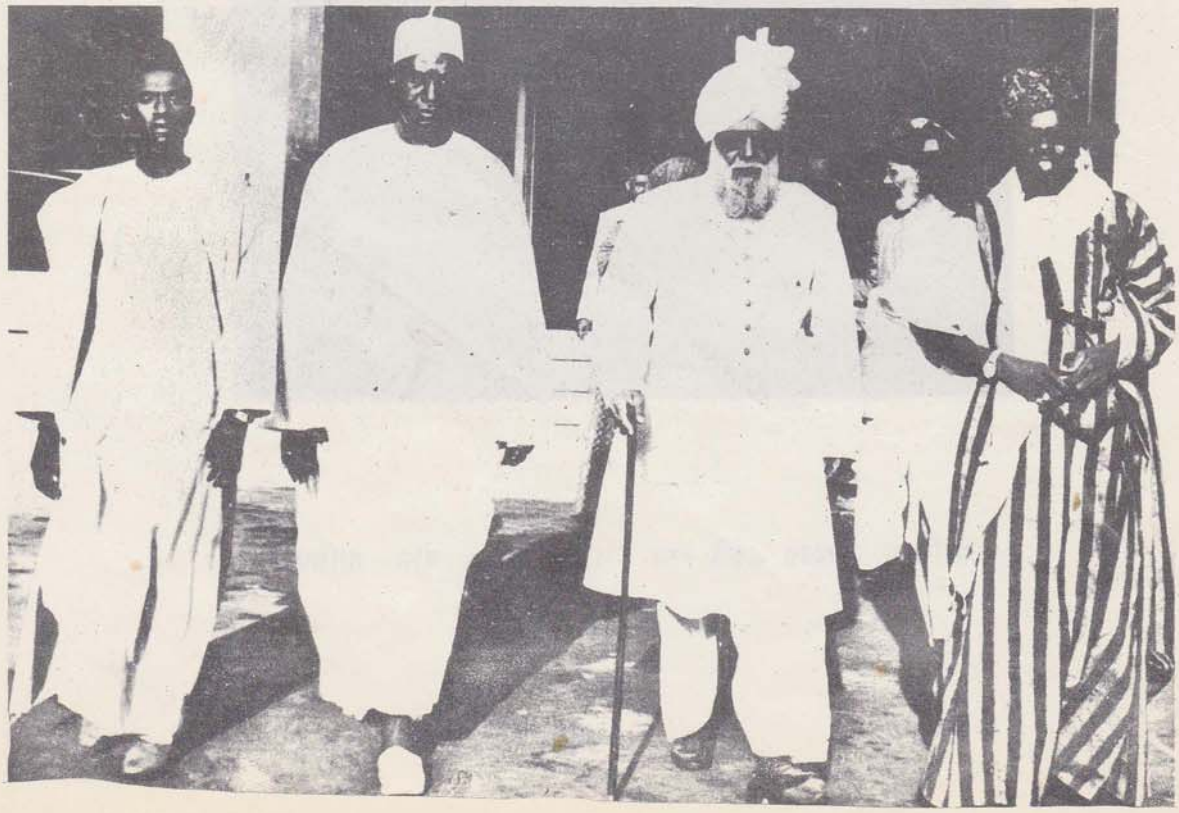

বিশ্বব্যাপী ইসলাম-প্রচার ও আহমদীয়া জামাত

—মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, নায়েব সদর
বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া

ইসলাম মানেই শান্তির ধর্ম। ইসলাম যুক্তি, জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার ধর্ম। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং জাতিসমূহ তথা সারা বিশ্বের জন্য শান্তির সওগাত নিয়ে এসেছে ইসলাম। এই উদ্দেশ্যে ইসলাম মানবজাতির সামনে পূর্ণতম জীবন-বিধান রূপে পেশ করেছে পবিত্র-গ্রন্থ আল-কুরআন এবং পূর্ণতম আদর্শ বা 'মডেল' রূপে পেশ করেছে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন এবং জীবনাদর্শকে। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন: "আল-ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম, ওয়া আতমামতু আলাইকুম নেমাতী ওয়া রাজিতু লাকুমুল ইসলামা দ্বীনা।' অর্থঃ "অদ্য আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণতা দান করিলাম, এবং তোমাদের উপর আমরা নেয়ামত পূর্ণ করিলাম, এবং তোমাদের জন্য ধর্ম হিসাবে ইসলামকে মনোনীত করিলাম।" (সুরা মায়েদা: ১ম রুকু)। ইসলাম ধর্মের পূর্ণতা এবং বিশ্বজনীনতা সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বহু জায়গায় ঘোষণা করেছেন। এখানে আমরা আরো কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করলাম। সুরা আরাফে আল্লাহতা'লা বলেছেন: "কুল ইয়া আইয়ুহান্নাসু ইন্নি রাসুলুল্লাহে ইলায়কুম জামিয়া।" অর্থ:—"বলো, হে মানব-জাতি, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের জন্য রসুল রূপে প্রেরিত হইয়াছি।" (সুরা আরাফ: ২০ রুকু)। এই উদ্ধৃতি থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিশ্ব-মানবের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহতা'লা তাঁকে মহা-কল্যাণের নিমিত্ত প্রেরণ করেছেন এবং সেজন্যই ঘোষণা করেছেন: "ওমা আরসালনাকা ইল্লা রহমতুল্লিল আলামীন। (সুরা আম্বিয়া: ৭ম রুকু)। অনুরূপভাবে আল্লাহতা'লা পবিত্র কুরআনের তিনটি সুরার মধ্যে ইসলামের অবশ্যাম্ভাবী বিশ্ববিজয় সম্বন্ধে ঘোষণা করে বলেছেন: "হুয়াল্লাযী আরসালা রাসুলাহু বিল হুদা ওয়া দ্বীনেল হাক্কে লে-ইউজহেরাহু আলাদ্দীনে কুল্লেহী।" অর্থঃ— "আমরা সত্যধর্ম ও হেদায়েত সহকারে এই রসুলকে প্রেরণ করিয়াছি যেন তিনি তদ্বারা ইহাকে (ইসলামকে) সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করিতে পারেন।" (সুরা-তাওবা: ৫ম রুকু, সুরা ফতেহ: ৪র্থ রুকু, এবং সুরা সাফ: ১ম রুকু)। বিভিন্ন তফসির-কারকগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এই আয়াতে ইসলামের যে বিশ্বব্যাপী বিজয় ও প্রাধান্য লাভের প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ(আঃ)-এর যমানায় পরিপূর্ণ হবে। [তফসিরে ইমাম ইবনে জারীর, তফসিরে কাদরী, মসনবে ইমামত, বেহারুল আনোয়ার, দ্রষ্টব্য]

বিশ্বব্যাপী প্রচারের মূল-কথা :

পবিত্র কুরআনে আল্লাহতা'লার এই ঘোষণা এবং প্রতিশ্রুতিগুলো সন্দেহাতীতরূপে সত্য বলে আমরা প্রত্যেক মুসলমান মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। আর যে ব্যক্তি অমুসলিম তার কাছে এই সকল ঘোষণার সত্যতা তখনই প্রমাণ করা সম্ভব যখন সে এই প্রতিশ্রুতি গুলোকে পূর্ণ হতে দেখবে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে আমরা যদি বাস্তব জগতের দিকে লক্ষ্য করি তা হলে দেখতে পাই যে পৃথিবীতে এখন প্রায় তিনশত কোটি অমুসলিম তথা হিন্দু, খৃষ্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ, নাস্তিক ইত্যাদি রয়েছে। অন্যদিকে মুসলমানগণ সংখ্যায় প্রায় ১০০ কোটির মত, তবে রাজনৈতিক এবং আদর্শগতভাবে বহু দল ও উপদলে বিভক্ত। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের কোন নেতা নেই, ইসলামী সংহতি ও ঐক্য নাই, মুসলমানদের কোন একক সংগঠন নাই এবং সর্বোপরি ইসলামী জীবন-বিধানের তথা পবিত্র কুরআনের অনুসারী সত্যিকার মুসলমানের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে খুবই কম। একদিকে অমুসলিমদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা এবং অন্যদিকে মুসলিম সমাজের মধ্যে বিরাজমান আভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতা এবং আদর্শহীনতা দ্বারা একথা অবশ্যই প্রমাণ হয় না যে আল্লাহতা'লার মহান প্রতিশ্রুতি সমূহ অপূর্ণ থেকে যাবে। তাহ'লে কিভাবে এবং কখন ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে? প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব-ব্যাপী ইসলামের পূর্ণভাবে বিজয় লাভের দুটি প্রধান দিক রয়েছে : (১) 'তকমীলে হেদায়েতে দ্বীন' বা ধর্মীয় বিধি-ব্যবস্থার পূর্ণতা, (২) 'তকমীলে এশায়াতে দ্বীন' বা ধর্মীয় প্রচারের পূর্ণতা। প্রথমোক্ত বিষয়টি পূর্ণতা লাভ করেছে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমন এবং পবিত্র কুরআনের অতুলনীয় এবং পরিপূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থা ও সৌন্দর্যের মাধ্যমে। দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ ইসলামের প্রচারের পূর্ণতা আল্লাহতায়ালার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সময়ে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন শতাব্দীতে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মোজাদ্দিদগনের মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠত্ব পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত হয়েছে। বিশেষতঃ হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আগমনের দ্বারা বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার কার্য পরিপূর্ণতা লাভ করবে এবং অন্যান্য সকল ধর্ম ও মতবাদের উপর ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য চূড়ান্তভাবে বিজয় লাভ করবে বলে পবিত্র কুরআন, হাদীস ও অন্যান্য অনেক ধর্মগ্রন্থে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করে যথাসময়ে আল্লাহতায়ালা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে প্রেরণ করেছেন ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ রূপে এবং তিনি আল্লাহতায়ালার নির্দেশে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে 'আহমদীয়া আন্দোলন' নামে একটি আধ্যাত্মিক জামাতের প্রতিষ্ঠা করেন। এই জামাতই আজ বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার কার্যে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছে এবং সেইসঙ্গে বাস্তব জীবনে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করছে। এই ব্যবস্থার মূল-ভিত্তি

হলো আল্লাহতা'লার প্রত্যক্ষ অনুমোদন, সাহায্য এবং সমর্থন। তাই আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আল্লাহতা'লা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে জগতের বুকে ইসলামের প্রচারের একটি 'নীল নকসা' পেশ করেছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী পূর্ণভাবে ইসলাম প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ইসলামের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সার্বিকভাবে বিজয় লাভ করবে। এই প্রচার তৎপরতার কয়েকটি বিশেষ দিক হলো: (১) হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) স্বয়ং এবং তাঁর মাধ্যমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থার পরিচালনাধীনে ইসলামের প্রচার কার্য অত্যন্ত সুসংবদ্ধভাবে উন্নতির পর উন্নতি করছে; (২) তাঁর আবির্ভাবের সময় থেকে অর্থাৎ হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ (১৩০৬ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৯ খৃঃ) হতে শুরু করে তিন শত বছরের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে; (৩) এই তিন শত বছরের পর যারা আহমদীয়া জামাতের মাধ্যমে ইসলামে দাখিল হবে না তারা মানব-সমাজে অত্যন্ত নগণ্য এবং গুরুত্বহীন বলে পরিগণিত হবে; (৪) বিশেষতঃ আগামী ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত সময় এবং তার পরবর্তী সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—যখন আহমদীয়া আন্দোলনের দ্বিতীয় শতাব্দী শুরু হবে। এই সময়ে বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয় বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে।

আল্লাহ্তায়ালা ইলহামের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে বলেছেন:

(ক) "আমি তোমার প্রচারকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাইব।" [তাযকেরা]

(খ) "পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী আসিলেন, কিন্তু পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করিল না; পরন্তু খোদা তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং পরাক্রমশালী আক্রমণ সমূহ দ্বারা তাঁহার সত্যতা সুপ্রকাশিত করিবেন।" [তাযকেরা]

(গ) "আমি তোমার সঙ্গে আছি, হে রসুলুল্লাহর (আধ্যাত্মিক) পুত্র! ভূ-পৃষ্ঠের সকল মুসলমানকে একই ধর্মের (ইসলামের) উপর একত্রিত কর।" [তাযকেরা]

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) আল্লাহ্তা'লার কাছ থেকে জানতে পেরে ঘোষণা করেছেন:

(ক) "আজিকার দিন হইতে তৃতীয় শতাব্দী পার হইবে না.....পৃথিবীতে তখন একই ধর্ম (ইসলাম) থাকিবে এবং একই ধর্মনেতা (হযরত মুহাম্মদ সাঃ) হইবেন। আমি কেবল বীজ বপন করিতে আসিয়াছি; এখন উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে এবং ফুল ও ফলে সুশোভিত হইবে। কেহ ইহাকে রোধ করিতে সক্ষম হইবে না।"

['তাজকেরাতুশ শাহাদাতাইন' ১৯০৪ খৃঃ]

(খ) "আমার জামাত ফুলে-ফলে সুশোভিত হইয়া দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করিবে এবং অচিরে সারা জগত ছাইয়া ফেলিবে। বহু বাধা বিঘ্ন দেখা দিবে এবং পরীক্ষা আসিবে। কিন্তু খোদা সেগুলিকে পথ হইতে অপসারিত করিয়া দিবেন এবং আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবেন।" ("তাজাল্লিয়াতে এলাহিয়া")

অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহতায়ালার প্রতিশ্রুতিসমূহ কিভাবে বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে তারই একটি রূপরেখা অতি সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা হলো। এ সম্বন্ধে ভালভাবে জানতে হলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আহমদীয়া জামাতের মিশন, মসজিদ এবং প্রচার কেন্দ্র হতে পুস্তকাদি, পত্র-পত্রিকা অথবা যে কোন প্রাসঙ্গিক খবরাদি সংগ্রহ করা যেতে পারে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক আহমদীয়া জামাতের কেন্দ্র রাবোয়া (পাকিস্তান), কাদিয়ান (ভারত), ঢাকা (বাংলাদেশ) অথবা অন্যান্য দেশের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

এখন আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ আহমদীয়া জামাতের ইসলাম প্রচার তৎপরতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটি রিপোর্ট পেশ করবো। গাছ যেমন তার ফল দ্বারা পরিচিত হয়, তেমনি আহমদীয়া জামাতের প্রচার সাফল্য বিভিন্ন পর্যায়ে শত-সহস্র বাধা-বিপত্তি সত্বেও—আল্লাহতালার বিশেষ ফজল, তায়ীদ ও নুসরতের ফলে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি লাভ করছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আহমদীয়া জামাতের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলাম-প্রচার তৎপরতার নিম্নোক্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক অতি সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা হলো: (১) বিভিন্ন মহাদেশে আহমদীয়া মিশন, মসজিদ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং প্রচার তৎপরতা; (২) বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ও তফসির প্রনয়ন ও প্রকাশনা এবং অন্যান্য ইসলামী পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশনা; (৩) ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পুন প্রচারের জন্য সাংগঠনিক কাঠামো।

এশিয়া মহাদেশ:

এশিয়া মহাদেশের নিম্নোক্ত দেশ সমুহে আহমদীয়া জামাতের মসজিদ ও মিশন রয়েছে। এই সকল স্থান হতে নিয়মিতভাবে ইসলাম প্রচার-কার্য এবং সেইসঙ্গে ইসলামী তালিম ও তরবীয়তের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এই সকল দেশের মধ্যে রয়েছে—পাকিস্তান, ইণ্ডিয়া, বাংলাদেশ, ইরান, ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়া, লেবানন, ইস্রায়েল, মস্কত, কুয়েত, এডেন, ইন্দোনেশিয়া, বোর্নিও দ্বীপ, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, বার্মা, ফিলিপাইন, হংকং, জাপান, ফিজি আইল্যাণ্ডস।

এই সকল দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং কোথাও কোথাও দুর-দুরান্তে অবস্থিত লোকবসতি গুলিতেও আহমদীয়া জামাত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ইন্দোনেশিয়ার ৬০টি মসজিদ রয়েছে এবং বোর্নিও দ্বীপের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে যেমন—লাবুয়ান, রানাও, সাণ্ডকান, তাওয়াউ ইত্যাদি অঞ্চলে আহমদীয়া জামাত রয়েছে। ইন্দোনেশিয়ায় আহমদীয়া প্রচার তৎপরতা সম্বন্ধে Justus M. Van Der Kroff লিখেছেন: "Ahmadiyya Movement in Indonesia are broadly scattered over the islands, one even finds them in remote rural areas", ('The Muslim world,' Jan. 1962)।

পাকিস্তানের রাবোয়ায় আহমদীয়া জামাতের বর্তমান হেড কোয়ার্টার্স রয়েছে এবং সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু মসজিদ এবং জামাত রয়েছে। তেমনিভাবে ইণ্ডিয়ায় আহমদীয়া জামাতের মূল কেন্দ্র কাদিয়ানে জামাত রয়েছে এবং সারা দেশে মসজিদ ও জামাত ছড়িয়ে রয়েছে। বাংলাদেশেও বিভিন্ন স্থানে আহমদীয়া জামাত ও মসজিদ রয়েছে এবং ঢাকায় এই সকল জামাতের কেন্দ্রীয় কার্যালয় রয়েছে।

আফ্রিকা মহাদেশ ঃ

পশ্চিম আফ্রিকার অন্তর্গত নিম্নোক্ত দেশ সমূহে আহমদীয়া জামাত, মসজিদ ও মিশন রয়েছে ঃ নাইজেরিয়া, ঘানা, লাইবেরিয়া, সিয়েরালিয়ন, টগোল্যাণ্ড, আইভরি-কোষ্ট এবং গাম্বিয়া। অনুরূপভাবে পূর্ব আফ্রিকার নিম্নোক্ত দেশে আহমদীয়া জামাত এবং মিশন রয়েছে ঃ কেনিয়া, টাঙ্গানিকা, উগাণ্ডা, এবং মরিশাস। এ ছাড়া আফ্রিকার অন্যান্য স্থানে বিশেষতঃ মিশর, দক্ষিণ আফ্রিকা, এবং সুদানে আহমদী রয়েছেন।

আল্লাহ্‌তালার ফজলে পশ্চিম আফ্রিকায় আহমদীয়া প্রচার ব্যবস্থা খুবই সাফল্যজনক ভাবে অগ্রসর হচ্ছে। ঘানায় ১৬১টি মসজিদ, ১৪টি স্কুল এবং কয়েকটি চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে। পশ্চিম আফ্রিকার অন্যান্য দেশে "নুসরত জাহান পরিকল্পনার" মাধ্যমে ১৬টি চিকিৎসা কেন্দ্র, ১৮টি সেকেণ্ডারী স্কুল এবং আরো কয়েকটি ছোট স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ঘানায় স্থানীয় মুবাল্লীগ প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা রয়েছে। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে আহমদীয়া জামাতের বর্তমান নেতা (খলিফা) হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) যে সফর করেন তার ফলে এই সকল স্থানে ইসলাম প্রচার তৎপরতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্তুতঃপক্ষে ইসলামের জয়-যাত্রা শুরু হয়ে গেছে এবং সেই কারণেই পাশ্চাত্যের কোন চিন্তাবিদ বাধ্য হয়ে স্বীকার করেছেন ঃ "That there is a challenge to the Christian Church cannot be doubted. It is not yet decided whether the Cross or the Crescent shall rule over Africa." ["Christ or Mohammad"—by S. G. Williamson University of Gold Coast 1953] অনুরূপভাবে পশ্চিম আফ্রিকায় খ্রীষ্ট-ধর্মের ভবিষ্যত সম্পর্কে জনৈক প্রখ্যাত লেখকের মন্তব্যও এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য ঃ "I can make my verdict in the shortest of sentences. I Can make it in one word : 'None". ['Future of Christianity in West Africa' by Tai Solarim, published in 'Daily Time', Sept. 1961]

ইউরোপ ও আমেরিকা ঃ

ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে আহমদীয়া মসজিদ, মিশন এবং জামাত রয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ যুক্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানী, হল্যাণ্ড, স্পেন, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইজারল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বৃটিশ গিয়ানা,

ত্রিনিদাদ এবং ডাচ গিয়ানা। শীঘ্রই ফ্রান্স, দক্ষিণ আমেরিকা এবং অন্যান্য স্থানে মিশন খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। পৃথিবীর অন্যান্য এবং কম্যুনিষ্ট অধ্যুসিত দেশগুলিতেও নিয়মিতভাবে আহমদীয়া জামাত এবং প্রচার ব্যবস্থা না থাকলেও সেখানে আহমদী রয়েছেন এবং তাঁরা নিজ সামর্থ অনুযায়ী দ্বীন ইসলামের খেদমত করে যাচ্ছেন।

যুক্তরাজ্যের ওকিং শহরে চৌধুরী যতেহ্ মুহাম্মদ সাইয়াল কর্তৃক সর্ব-প্রথম আহমদীয়া প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৪ সালে স্থায়ীভাবে লণ্ডনে আহমদীয়া মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। লণ্ডন ছাড়াও যুক্তরাজ্যের অন্যান্য ২১টি স্থানে আহমদীয়া জামাত রয়েছে, যেমন ব্লাকবার্ণ, লিডস্, গ্লাসগো, প্রিসটন, শেফিল্ড, অক্সফোর্ড বার্মিংহাম, ম্যানচেষ্টার ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে জার্মানীর হামবুর্গ, ফ্রাঙ্কফার্ট ও নূরেনবার্গে আহমদীয়া মিশন রয়েছে। স্ক্যাণ্ডিনিভিয়ায় কোপনহেগেন মিশনকে কেন্দ্র করে নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কে প্রচার কার্য পরিচালিত হচ্ছে। ডেনমার্কে সুদৃশ্য মসজিদটি আহমদী মেয়েদের আর্থিক কুরবানীর স্বাক্ষর বহণ করছে। বিগত ১৯৭৬ সালে বিশ্ব আহমদীয়া জামাতের নেতা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) সুইডেনের অন্তর্গত গোটেনবার্গ শহরে একটি নতুন মসজিদের উদ্বোধন করেছেন।

উত্তর আমেরিকায় সর্বপ্রথম মিশন খোলা হয় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে এবং উহার সর্বপ্রথম মিশনারী ছিলেন হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক (রাঃ)। আল্লাহ্‌র ফজলে যুক্তরাষ্ট্রে দুই ডজনের অধিক সুসংগঠিত জামাত রয়েছে। ওয়াশিংটনে অবস্থিত "আমেরিকান ফজল মস্ক" হলো আমেরিকান মিশনসমূহের হেডকোয়ার্টার। কানাডায় টরেন্টো শহরে একটি বড়ো জামাত রয়েছে এবং সেখানে একটি বড়ো মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনাও গৃহিত হয়েছে। সাম্প্রতিক অমেরিকা সফরের প্রাক্কালে আহমদীয়া জামাতের মহান নেতা ঘোষণা করেন যে, "আমি প্রেম, ভালবাসা এবং নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমে সমগ্র মানব-জাতির নিকট ইসলামের পয়গাম পৌছাতে চাই এবং তাহাদেক জানাতে চাই যে, সমগ্র মানব-জাতির প্রকৃত কল্যাণ ও সফলতা একমাত্র ইসলামের সঙ্গেই সংযুক্ত রয়েছে।"

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসাকেন্দ্র :

১৯৭৬ সাল পর্যন্ত আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে নিম্নলিখিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসা-কেন্দ্র সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে :—

	স্কুল ও কলেজ	চিকিৎসা-কেন্দ্র
(১) তাহরীকে জদীদ স্কীমের অধীন	৭৬টি	×
(২) নুসরত জাহান স্কীমের অধীন	২৯টি	১৯টি

The Ahmadiyya Chief replying to the welcome speech by the President Tubman.

THE FORMAL OPENING OF THE KUMASI MISSION HOUSE

Huzoor is amongst the Ahmadiyya Muslim Missionaries in U.S.A.

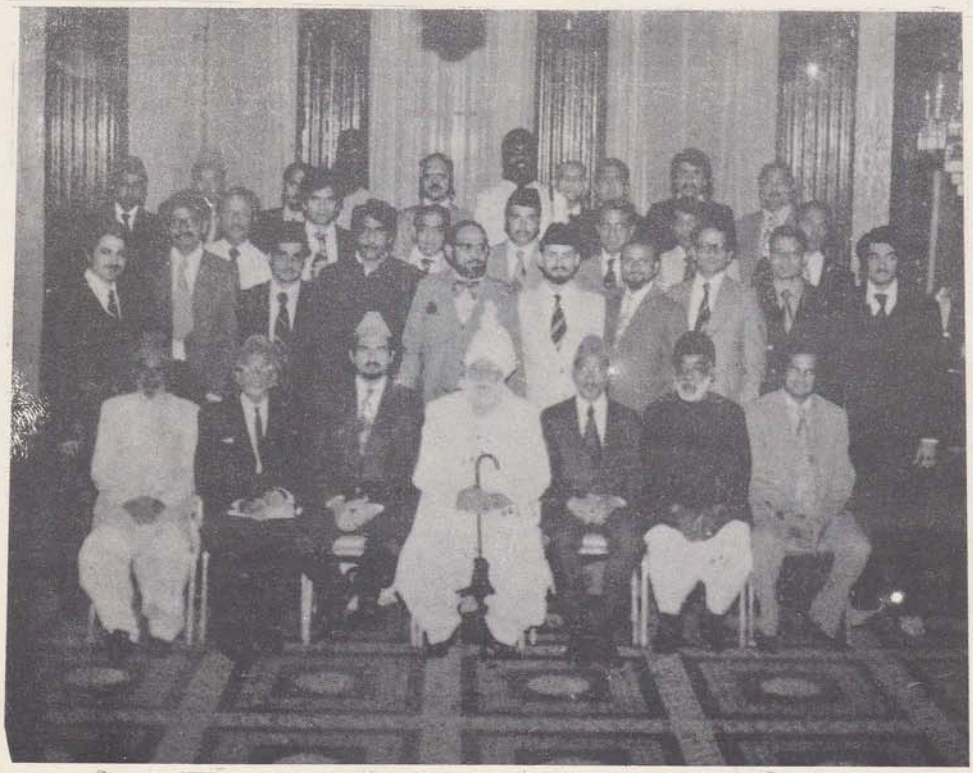

RECEPTION AT HOTEL AUSTORIA AT NEW YORK.—USA.

আফ্রিকার উপরোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়াও পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশীয়া, ইসরায়েল প্রভৃতি দেশে শিক্ষালয় সমূহ রয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষালয় ছাড়াও কোন কোন স্থানে প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী স্কুল এবং কলেজ রয়েছে।

আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্নস্থানে মেডিক্যাল মিশন স্থাপিত হয়েছে। ফিজি দ্বীপপুঞ্জ, মরিশাস, পূর্ব আফ্রিকা, নাইজেরিয়া, ঘানা প্রভৃতি স্থানে আমাদের হাসপাতাল ও চিকিৎসা-কেন্দ্র রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এই পরিসংখ্যানের মধ্যে পাকিস্তান, ভারত এবং বাংলাদেশের বাহিরে যে সকল দেশে মিশন, মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে শুধু সেইগুলির হিসাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাকিস্তানের সকল জিলায় আহমদীয়া মসজিদ ও প্রচারকেন্দ্র তথা স্থানীয় জামাত ও মজলিস সমূহ রয়েছে। অনুরূপভাবে ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আহমদীয়া মসজিদ, মিশন ও স্থানীয় জামাত সমূহ রয়েছে।

কুরআন শরীফের অনুবাদ ও তফসির প্রণয়ন ও প্রচার ঃ

আমরা প্রারম্ভেই উল্লেখ করেছি যে, ইসলাম সর্বজনীন ধর্ম—সর্বকালের সকল মানুষের জন্য আগমন করেছেন রহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য হেদায়েতরূপে নাযেল হয়েছে মহাগ্রন্থ 'আল-কুরআন'। ইসলামের বিশ্বজনীনতার আলোকে চিন্তা করলে বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি সমূহের জন্য কুরআন করীমের অনুবাদ ও তফসির প্রণয়ন ও প্রকাশ করার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে এই কাজ করা সম্ভব নয়। একমাত্র আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান তথা খেলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্রমাগত ভাবে এই কাজ করে যেতে হবে—তবেই বিশ্বের সকল ভাষার সকল লোকের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছানো সম্ভবপর। এই উদ্দেশ্যেই আহমদীয়া জামাত বিশ্বব্যাপী কুরআনের প্রচার-কার্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে।

আহমদীয়া জামাত কর্তৃক নিম্নলিখিত ভাষায় কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে ঃ উর্দু, ইংরেজী, জার্মান, ডাচ, ডেনিশ, সুহেলী, লুগাণ্ডি, ইউরোবা ও স্প্যানিশ। ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় ১০ পারা প্রকাশিত হয়েছে এবং অবশিষ্ট মুদ্রণের অপেক্ষায় রয়েছে। বাংলা, যুগোশ্লাভ এবং আরো কয়েকটি ভাষায় অনুবাদ ও তফসিরের কাজ চলছে। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাতেও অনুবাদ প্রণয়নের জন্য প্রোগ্রাম জারী রয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে উর্দু ও ইংরেজী ভাষায় কুরআন করীমের "তফসিরে কবীর" ও "তফসিরে সগীর" প্রকাশ করা হয়েছে। তিন সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় (ডবল সাইজ) লিখিত তফসিরে কবীর জ্ঞান-জগতের একটি অফুরন্ত ভাণ্ডার এবং একটি মহা-বিস্ময়। ইহা ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব, গাম্ভীর্য এবং মহত্বের নযীরবিহীন দৃষ্টান্তস্বরূপ ; ইহা ইসলাম প্রচার কার্যের জন্য—বিশেষতঃ সুধী মহলের জন্য এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক শক্তি স্বরূপ।

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী প্রোগ্রামের অধীনে আরবী, ফারসী এবং যুগোশ্লাভ ভাষায় কুরআন করীমের তফসির প্রণয়ন ও প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ইসলামী বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা প্রণয়ন ও প্রচার :

বর্তমান যমানা হলো প্রচারের যুগ। বর্তমান সভ্যতার দ্রুত উন্নতির মূলে প্রেস বা মুদ্রণ শিল্পের অবদান সবচেয়ে বেশী। আর এই মুদ্রণ-যন্ত্রের আবিষ্কার এবং সর্বাধিক প্রয়োগও হয়েছে বর্তমান যুগে। এছাড়াও রয়েছে অন্যান্য প্রচার মাধ্যম—রেডিও, টিভি, ইত্যাদি। এই সকল সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে মিলিত হয়েছে সর্বাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা—জলে, স্থলে এবং অন্তরীক্ষে। এই সকল সুযোগ-সুবিধার বিস্ময়কর প্রকাশ কি শুধু বৈষয়িক উন্নতির জন্যই হয়েছে? মূলতঃ এই সকল উন্নতির উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক পরিকল্পনা তথা এশায়াতে ইসলামের পূর্ণতার জন্যও বটে। এইজন্যই আল্লাহতায়ালা এযুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-কে প্রেরণ করেছেন যেন তাঁর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বাস্তব পরিকল্পনার দ্বারা ইসলামী শিক্ষা পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তার লাভ করতে পারে। সেই জন্যই স্বয়ং আল্লাহ্-তায়ালা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-কে 'সুলতানুল কলম' বা 'লেখনী সম্রাট' উপাধী দ্বারা ভূষিত করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেছেন: "আমি তরবারির কার্য কলম দ্বারাই করিয়াছি।"

মানব জীবনের যাবতীয় প্রশ্নের যথোপযুক্ত সমাধান দিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) কুরআন ও হাদীসের আলোকে ৯০ খানা পুস্তক লিখেছেন। তিনি ইসলামকে জ্ঞান-জগতে সু-প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন এবং সকল ধর্মের ও মতবাদের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করেছেন অখণ্ডনীয় যুক্তি, জ্ঞান ও জীবন্ত নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে।

বিভিন্ন দেশে আহমদীয়া জামাত কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকার একটী তালিকা দেওয়া হলো :

		দেশ	শহর
১।	'আল-ফজল' (দৈনিক, উর্দু)	পাকিস্তান	রাবওয়া
২।	'রিভিউ অব রিলিজিয়নস' (ইংরেজী, মাসিক)	ঐ	ঐ
৩।	আল-কুরআন, (মাসিক, আরবী)	ঐ	ঐ
৪।	'খালেদ' (মাসিক, উর্দু)	ঐ	ঐ
৫।	'তাশ্হীযুল আযহান' (মাসিক, উর্দু)	ঐ	ঐ
৬।	'তাহরীকে জদীদ' (মাসিক, উর্দু ও ইংরেজী)	ঐ	ঐ

৭। 'মিসবাহ্' (মাসিক, উর্দু)	পাকিস্তান	~~ঐ~~ রাবোয়া
৮। 'বদর' (সাপ্তাহিক, উর্দু)	ভারত	কাদিয়ান
৯। 'মিনারেট' (ইংরাজী, ত্রৈমাসিক)	ঐ	কালিকট
১০। 'সমাধানয়জি' (তামিল, ভাষা)	ঐ	মাদ্রাজ
১১। 'যুগ রশ্মি' (বার্ষিক, হিন্দি)	ঐ	বোম্বাই
১২। 'আল-বুশরা' (বাংলা, মাসিক)	ঐ	কলিকাতা
১৩। 'আহ্মদী' (বাংলাদেশ, পাক্ষিক)	বাংলাদেশ	ঢাকা
১৪। 'আল-বুশরা' (উর্দু ও ইংরাজী, ষান্মাসিক)	বার্মা	রেঙ্গুন
১৫। 'মুসলিম সানরাইজ' (মাসিক, ইংরাজী)	যুক্তরাষ্ট্র	ডেটন
১৬। 'আহমদীয়া গেজেট' (ইংরাজী, পাক্ষিক)	ঐ	ঐ
১৭। 'আল আনসার' (ইংরেজী, মাসিক)	ঐ	ঐ
১৮। 'দি ইসলাম' (সুইচ ভাষা, মাসিক)	সুইজারল্যাণ্ড	যুরীখ
১৯। 'আল বুশরা' (আরবী, মাসিক)	ইস্রায়েল	হাইফা
২০। 'সিনার ইসলাম' (ইন্দোনেশী ভাষা, মাসিক)	ইন্দোনেশিয়া	জাকার্তা
২১। 'দি ট্রুথ' (ইংরেজী, সাপ্তাহিক)	নাইজেরীয়া	লাগোস
২২। 'দি মেসেজ' (মাসিক, ইংরেজী ও তামিল)	শ্রীলঙ্কা	কলম্বো
২৩। 'আল-বুশরা—গ্লাড টাইডিংস' (ইংরেজী)	সিঙ্গাপুর	সিঙ্গাপুর
২৪। 'আল ইসলাম' (ডাচ ভাষা, মাসিক)	হল্যাণ্ড	হেগ
২৫। 'মেপাঞ্জিয়া মুঙ্গা' (সুহেলী ভাষা, মাসিক)	পূর্ব আফ্রিকা (কেনিয়া)	নাইরোবী
২৬। 'ইষ্ট আফ্রিকান টাইমস্' (ইংরেজী, পাক্ষিক)	ঐ	ঐ
২৭। 'আখবারে আহমদীয়া' (উর্দু, পাক্ষিক)	ঐ	ঐ
২৮। 'আহমদীয়া গেজেট' (জার্মান ভাষা পাক্ষিক)	পঃ জার্মানী	হামবুর্গ
২৯। 'দি ভয়েস অব ইসলাম' (লুগাণ্ডি, মাসিক)	উগাণ্ডা	জাঞ্জা
৩০। 'দি ভয়েস অব ইসলাম' (ইংরেজী, মাসিক)	ঐ	কাম্পালা
৩১। 'আখবারে আহমদীয়া' (উর্দু, পাক্ষিক)	ঐ	জাঞ্জা
৩২। 'আহমদীয়াত দি ইসলাম, (ইংরেজী, মাসিক)	ত্রিনিদাদ	জর্জ্জটাউন
৩৩। 'দি মুসলিম টর্চ লাইট' (ইংরেজী, মাসিক)	ঐ	ঐ
৩৪। 'জাম্বাজাম্বা' (ইংরেজী, মাসিক)	তাঞ্জানিয়া	দারেস সালাম
৩৫। 'আখবারে আহমদীয়া' (উর্দু, পাক্ষিক)	ঐ	ঐ
৩৬। 'মুনাদী ইসলাম' (ইংরেজী ও হিন্দী, মাসিক)	ফিজি দ্বীপপুঞ্জ	—
৩৭। 'লা মেসেজ' (ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজী, পাক্ষিক)	মরিশাস	রোজহিল

৩৮।	'আল আসর' (ইংরেজী, মাসিক)	দক্ষিণ আফ্রিকা	কেপটাউন
৩৯।	'আল-বুশরা' ঐ	ঐ	ঐ
৪০।	'দি গাইড্যান্স' ঐ	ঘানা	সল্টপণ্ড
৪১।	'আফ্রিকান ক্রিসেন্ট' (ইংরেজী, মাসিক)	সিয়েরালিয়ন	বোও
৪২।	'আহমদীয়াত' (ডাচ ভাষা মাসিক)	ডাচ গিয়ানা	—
৪৩।	'অ্যাকটিভ ইসলাম' (ডেনিশ ভাষা)	ডেনমার্ক	কোপেনহেগেন
৪৪।	'মুসলিম হেরাল্ড' (ইংরেজী, মাসিক)	যুক্তরাজ্য	লণ্ডন
৪৫।	'আহ্‌মদীয়া গেজেট' (ইংরেজী পাক্ষিক)	ঐ	ঐ
৪৬।	'আখবারে আহমদীয়া' (উর্দু, পাক্ষিক)	ঐ	ঐ
৪৭।	'আল-ইসলাম' (ইংরেজী, মাসিক)	গাম্বিয়া	বাঙ্গিল
৪৮।	'নিউজ এণ্ড ওয়েভজ' (ইংরেজী)	সিয়েরালিয়ন	বোও

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী প্রোগ্রাম ঃ

বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামাতের কেন্দ্র রাবোয়ায় অনুষ্ঠিত ১৯৭৩ সালের সালানা জলসায় হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) এই মহান বরকত-মণ্ডিত প্রোগ্রাম পেশ করেছেন। তিনি বলেন যে "আল্লাহতা'লার 'হামদ' ও 'আজম' এই দুই শব্দের অভিব্যক্তি ১৯৮৯ সনে আমাদের জামাতের পক্ষ হইতে শত-বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে হইবে।" ["আহমদী" ১৫/৬/৭৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য]

এই সময়ে অর্থাৎ শতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ইসলাম প্রচার করার যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তার কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ—

(১) পশ্চিম আফ্রিকায় তিনটি প্রধান প্রচার কেন্দ্র স্থাপন। (২) পূর্ব আফ্রিকায় অনুরূপ তিনটি প্রচার কেন্দ্র স্থাপন। (৩) ইটালী, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে ও দক্ষিণ আমেরিকায় কায়েমী মিশন স্থাপন ও মোবাল্লিগ প্রেরণ। (৪) চীনা, স্পেনীয়, ইটালিয়ান, হাউসা, যুগোশ্লাভ এবং পশ্চিম আফ্রিকান দুটি প্রধান ভাষায় কুরআনের অনুবাদ প্রণয়ন ও প্রকাশ। (৫) আরবী ভাষায় কুরআনের তফসির প্রণয়ন ও প্রকাশ। (৬) ফরাসী ও যুগোশ্লাভ ভাষায় কুরআনের সংক্ষিপ্ত তফসির প্রণয়ন ও প্রকাশ। (৭) পৃথিবীর ১০০টি ভাষায় মৌলিক ইসলামী পুস্তকাদি প্রণয়ন ও প্রচার। (৮) বহির্দেশে দুইটী স্থানে বড় আকারের প্রিন্টিং প্রেস স্থাপন। (৯) শক্তিশালী বেতার-কেন্দ্র স্থাপন।

আহমদীয়া শতবার্ষিকী প্রোগ্রামের মধ্যে আগামী শতাব্দীর মধ্যে ইসলামের বিজয় সাধনের মহান সংকল্প, অবিরাম দোওয়া ও কুরবানীর মহান পরিকল্পনা অন্তঃস্থত হয়েছে।

সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার কার্য পরিচালিত হচ্ছে। আহ্মদীয়া জামাতের এই সুষ্ঠু সংগঠন এবং কর্ম-তৎপরতার পূর্ণ বিবরণ এখানে দেয়া সম্ভব নয়। ইসলামী খেলাফতের পরিচালনাধীনে যে সকল প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলোর মধ্যে যে কোন একটির কার্যপ্রণালী, উদ্দেশ্য এবং আদর্শ অত্যন্ত সুদূর-প্রসারী। প্রধান কয়েকটি বিভাগের মধ্যে সদর আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার অধীনস্থ নেযারত সমূহ বিশেষভাবে কেন্দ্রীয় কাজ-কর্ম সম্পাদনের জন্য নিয়োজিত রয়েছে। অন্যান্য বিভাগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ (১) তাহ্রীকে জদীদঃ—বিশেষভাবে বহির্দেশে ইসলাম প্রচার কার্যে নিয়োজিত ; (২) ওয়াকফে জদীদ—বিশেষভাবে আভ্যন্তরীন তালিম-তরবিয়ত ও তবলীগের কাজে নিয়োজিত ; (৩) আভ্যন্তরীণ তরবীয়তী নেজাম সমূহ ঃ—বয়স্ক, যুবক, কিশোর, মহিলা ও কিশোরী মেয়েদের জন্য যথাক্রমে মজলিস আনসারুল্লাহ্, মজলিস খোদ্দামুল আহ্মদীয়া, আতফালুল আহ্মদীয়া, লাজনা এমাউল্লা ও নাসেরাতুল আহ্মদীয়া নামক তরবিয়তী শাখা প্রতিষ্ঠান—যেগুলো পৃথিবীর সকল আহ্মদীয়া জামাতে ছড়িয়ে রয়েছে এবং নিজ নিজ গঠণতন্ত্র অনুযায়ী তরবিয়ত ও সেবামূলক কাজ-কর্ম করে যাচ্ছে ; (৪) নুসরত জাহান রিজার্ভ ফাণ্ড ও লিপ ফরওয়ার্ড স্কীম—বিশেষ করে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করছে ; (৫) ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন—প্রধানতঃ লাইব্রেরী স্থাপন, গবেষণামূলক গ্রন্থাদি প্রণয়ন এবং বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী পুস্তকাবলী প্রণয়নের জন্য একাডেমী স্থাপনের কাজে নিয়োজিত রয়েছে ; (৬) শতবার্ষিকী জুবিলী প্রোগ্রাম (এ সম্পর্কে অন্যত্র বর্ণনা দেওয়া হয়েছে)। এই সকল প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সামনে রেখে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থিত সকল শাখা জামাত এবং ঐ শাখা জামাতের অন্তর্গত অন্যান্য স্থানীয় জামাত, মসলিস ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে, শান্তিপূর্ণভাবে, খোদার ফজলে ও রহমে ক্রমান্বয়ে গতিতে দিনের পর দিন কাজ করে যাচ্ছে। একথা সত্য যে, ধর্মের কাজ যতই কঠিন হোক—বিশেষতঃ বস্তুবাদী, সমস্যা-জর্জরিত দাজ্জালী ফেতনা-ফাসাদ-পূর্ণ পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে ধর্মের সত্যিকার আবেদন খুব কম লোকের কাছেই রয়েছে, কিন্তু তবুও এক-দুই করে আহ্মদীয়া আন্দোলনের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক এসে সমবেত হচ্ছেন—এবং এভাবে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী পূর্ব গৌরবসহ প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে (ইনশাল্লাহ)।

পরিশেষে হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর ভাষায় বলতে চাই ঃ

"হর তরফ আওয়াজ দেনা হ্যায় হামারা কাম আজ।
জিসকি ফিতরত নেক হ্যায় আয়েগা উয়ো আনজাম কার ।।"

—"চতুর্দিকে আওয়াজ দেওয়াই আমাদের কাজ
যাহার স্বভাব নেক সে পরিশেষে নিশ্চয়ই আসিবে।"

সকল প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য।

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ঃ উদ্দেশ্য ও কর্ম-পদ্ধতি

—মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্, কায়েদ, ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া।

মানবসন্তান অনিশ্চিত কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে ধ্বংসোন্মুখ পৃথিবীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পথহারা মানবজাতি আজ যুদ্ধ ও বিশ্ব-যুদ্ধের আশংকায় ভীত-শঙ্কিত। এই আতঙ্কের মাঝে কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না প্রকৃত শান্তি। তাই জ্ঞানান্ধ মানবকে শান্তি দানের উদ্দেশ্যে করুণাময়ের কৃপাসিন্ধু উদ্বেলিত হয়েছে। শান্তিপূর্ণ পৃথিবীর রূপরেখা অঙ্কিত 'ইসলাম'-এর বিশ্ব-জনীন পুনর্বিজয়ের নিমিত্তে 'শান্তির বার্তা' নিয়ে 'শান্তির দূত' প্রেরিত হয়েছেন তাঁর তরফ থেকে। ইসলাম-এর সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্দী জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)।

কেবলমাত্র জামাতে আহমদীয়াই আজ খেলাফতের ছত্রছায়ায় সুশৃংখল কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে সুনিশ্চিত লক্ষ্য—'শান্তিপূর্ণ' পৃথিবীর নীল-নকশা বাস্তবায়নে কর্মতৎপর। উক্ত রূহানী কর্মসূচীতে জামাতের ক্রমবর্ধমান আবশ্যকতা পূরণের জন্য হযরত মির্যা বাশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলিফাতুল মসীহ সানী আল-মুছলেহ মওউদ (রাঃ) ইংরেজী ১৯৩৮ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আহমদী যুবকদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে "মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া" নামের যুবসংগঠন কায়েম করেন। পনর থেকে চল্লিশ বৎসর বয়স্ক প্রতিটি আহমদী পুরুষ এই সংগঠনের সদস্য। অনুরূপভাবে সাত থেকে পনর বৎসর বয়সের কিশোর আহমদীদের জন্য "মজলিসে আতফালুল আহমদীয়া" নামে একটি কিশোর সংগঠন করা হয় এবং উহার তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উপর অর্পিত হয়। এছাড়াও জামাতে আহমদীয়ার আরও কয়েকটি আভ্যন্তরীণ সংগঠন রয়েছে—'মজলিসে আনসারুল্লাহ' (চল্লিশোর্ধ বয়স্ক পুরুষদের জন্য), ২। নাসেরাতুল আহমদীয়া (অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছোট মেয়েদের জন্য) এবং ৩। 'লাজনা এমাউল্লাহ' (প্রাপ্ত-বয়স্কা মহিলাদের প্রতিষ্ঠান)। এই শাখা সংগঠণগুলি জামাতে আহমদীয়ার আভ্যন্তরীণ কাঠামোকে সুদৃঢ় করে শিকড়-গলিত প্রাচীরের ন্যায় মজবুত করেছে। অতএব, জামাতে আহমদীয়া আজ সারা বিশ্বে ইসলামের প্রতিনিধিত্বকারী একক সংগঠন যা সুরক্ষিত এক দুর্গ-সদৃশ। দুনিয়ার তাবৎ শক্তি এর মুকাবিলায় ব্যর্থ, অচল। কারণ এ সংগঠন জাগতিক শক্তির মুখাপেক্ষী নয়, বরং জাগতিক শক্তিও যার মুখাপেক্ষী সেই রূহানী-শক্তি দ্বারা লালিত।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم

"নেক কাজে একে অন্যের প্রতিযোগিতা কর"। – আল-কুরআন

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া

আহমদীয়া যুব সংগঠন
বিশ্ব কেন্দ্রীয় মজলিস

"যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতিসমূহের সংশোধন হইতে পারে না"।
– হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ)

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৩৮তম বার্ষিক জলসার একটি দৃশ্য। ভাষণ দিচ্ছেন— আল্লামা আব্দুল মালেক খান, নাজের ইসলাহ ও ইরশাদ, (রাবওয়া) পাকিস্তান।

আজকাল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত যুবক, কলেজ ও ইউনিভার্সিটীর ছাত্র তথা যুবসম্প্রদায় ধর্মের প্রতি এমনি উদাসীন হয়ে পড়েছে যে, তাদের মতে "ধর্ম-কর্ম" তো বার্ধক্যের কাজ, এখন কেন?" ধর্ম ও নৈতিকতাবোধের অভাব আজ সর্বস্তরে অত্যন্ত প্রকট। হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) তাই দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন: "যুবকদের সংশোধন ব্যতীত জাতি সমূহের সংশোধন হইতে পারে না।" তাই জাতীয় উন্নতির পূর্বশর্ত হিসেবে যুব সম্প্রদায়ের নৈতিক উন্নতির নিশ্চয়তা বিধান করাই মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রধান উদ্দেশ্য। বিপর্যস্ত মানব সভ্যতার এই ক্রান্তিলগ্নে "মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া" একটি ব্যতিক্রম। আল্লাহতায়ালার মনোনীত ধর্ম 'ইসলাম'-এর প্রতি অনীহা পোষণকারী যুবকদের জন্য মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া একটী আদর্শ, যা তাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করবে এবং ধর্মের একনিষ্ঠ সেবক হতে অনুপ্রাণিত করবে।

তাই আহমদীয়া কিশোর ও যুবকদের আল্লাহতায়ালার প্রতি অগাধ ভক্তি-বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপনের এবং খাতামান্নাবিয়ীন সৈয়দনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা জাগানোর উদ্দেশ্য 'মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া' তার সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত রেখেছে।

ইসলামের প্রতি অটল বিশ্বাস, নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম, জনসেবা প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত করার মাধ্যমে যুবকদেক খাঁটী ইসলামী ভাবধারায় পরিচালিত করে মানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধন করাই মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার মৌলিক উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য কার্যে রূপায়িত করতে প্রত্যেক আহমদী কিশোর (তিফল) ও যুবক (খাদেম)-কে সেলসেলার খেদমতে নিবেদিত-প্রাণ ও সার্থক কর্মীরূপে প্রস্তুত করার দায়িত্বে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া সচেষ্ট রয়েছে।

জামাতে আহমদীয়ার একটী শাখা-সংগঠন হিসেবে মহতী উদ্দেশ্যাবলী কার্যকর করতে এই প্রতিষ্ঠান "খলিফায়ে ওয়াক্ত"-এর নির্দেশের আলোকে নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে। এই কর্মপদ্ধতি মূলতঃ তালিম ও তরবিয়ত বিষয়ক। এই কর্মপদ্ধতির পূর্ণ অনুগমনে আহমদী যুবকগণ ইসলামের জীবন্ত ও মূর্তিমান আদর্শ হতে পারেন।

জামাতে আহমদীয়া সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। তেমনি এর আভ্যন্তরীণ তরবিয়তী সংগঠন হিসাবে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রয়েছে। যেহেতু "জামাতে আহমদীয়া" একটী নিছক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং রাজনীতির সাথে এর সংস্রব নেই, তাই বিশ্বের যে কোন দেশে অবস্থান করলেও জামাতে আহমদীয়া এক আধ্যাত্মিক নিয়মের শৃংঙ্খলে আবদ্ধ এবং মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত। উক্ত নিয়মের শৃংঙ্খলে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়াও পরিচালিত।

'মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া'র প্রধান "সদর মজলিস" নামে পরিচিত। তিনি জামাতে আহমদীয়ার কেন্দ্র রাবওয়ায় (পাকিস্তান) অবস্থান করেন। সেখান থেকে তিনি খলিফার নির্দেশানুযায়ী গোটা বিশ্বের আহ্‌মদী যুবকদের পরিচালিত করেন। মজলিসের বিভিন্ন কার্যাবলী বাস্তবায়নে সহায়তাকল্পে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিভিন্ন বিভাগ-সমূহ রয়েছে। উক্ত বিভাগগুলি পরিচালনার জন্য কার্যকরী 'সংসদ বা মজলিসে আমেলা রয়েছে। সদর মজলিসের অনুমোদনক্রমে দেশীয় পর্যায়ে "নায়েব সদর মজলিস" নিযুক্ত হন। তিনি কেন্দ্রীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার নির্দেশে নিজ দেশের আহমদী যুবকদের নেতৃত্ব দান করেন। অনুরূপভাবে স্থানীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রধানকে 'কায়েদ মোকামী বা স্থানীয় কায়েদ' বলা হয়। যে স্থানে তিন বা ততোধিক আহমদী যুবক বসবাস করে সেখানেই মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া গঠন করা হয়। স্থানীয় কায়েদ কেন্দ্রীয় বিভাগগুলির ন্যায় বিভাগ গঠন করে স্থানীয় আহমদী যুবকদের ইপ্‌সিত লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে নিয়ে যান। স্থানীয় কায়েদ তার উর্ধতন নেতাদের নির্দেশমত পরিচালিত হন।

সংক্ষেপে কয়েকটী কর্ম-বিভাগ সম্বন্ধে নিম্নে আলোকপাত করা হলো :

(১) 'এতেমাদ বা সাধারণ বিভাগ :— এই বিভাগ মজলিসের প্রত্যেক কার্যের রেকর্ড সুবিন্যস্তভাবে রক্ষা করে যাতে বিভিন্ন বিভাগের কার্যের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে ধারণা নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

(২) 'মাল' বা অর্থ বিভাগ : সকল সংগঠনেরই কার্যক্রম পরিচালনায় অর্থের প্রয়োজন। তেমনি মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বহুমুখী কার্য্যপরিচালনায়ও অর্থের প্রয়োজন। তাই হযরত খলিফায়ে ওয়াক্ত-এর অনুমোদনক্রমে এই বিভাগ সংগঠনের সদস্যদের থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে তহবিল গঠন করে। উক্ত তহবিলে কিশোররা পর্যন্ত চাঁদা দিয়ে শরীক হয়ে থাকে। উক্ত চাঁদা প্রদান এই সংগঠনের সকল কিশোর ও যুবকদের জন্য বাধ্যতামূলক। এমনিভাবে এই বিভাগ আহমদী কিশোর ও যুবকদের মধ্যে আর্থিক কুরবানীর এক বুনিয়াদ কায়েম করে।

(৩) তরবীয়ত বিভাগ : জামাতে আহমদীয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য পৃথিবীতে জীবন্ত ধর্ম ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করা। তাই এই বিভাগটী সুদূর-প্রসারী কর্মপন্থার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বংশধরকে ক্রমাগতভাবে এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত করে। যুবকদের চরিত্র, অভ্যাস ও প্রকৃতির মধ্যে ইসলামী ভাবধারা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই বিভাগ যুবকদিগকে বাজামাত নামাযের দিকে আহ্বান করতে থাকে ; সত্যতা, বিশ্বস্ততা, সময়ানুবর্তীতার প্রতি আগ্রহ জাগায়; কদাচার, কুঅভ্যাস, ধুমপান, সিনেমা ইত্যাদি থেকে দূরে থাকতে অনুপ্রাণিত

করে। যুবকরা যাতে ভাল অভ্যাসগুলি অর্জন এবং কুঅভ্যাসগুলি বর্জন করে, উত্তম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে পারে তজ্জন্য এই বিভাগ মাঝে মাঝে পবিত্র কুরআন ও আহাদীস থেকে পাঠ এবং সংশোধনমূলক বক্তৃতা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম-এর আয়োজন করে থাকে।

(৪) 'খেদমতে খালক' বিভাগ ঃ--আল্লাহতাআলা মানবজাতির জন্য দু'টি কর্তব্য নির্ধারিত করেছেন—(১) হুকুবুল্লাহ বা ঐশী প্রেম সংক্রান্ত কর্তব্য সমূহ পালন এবং (২) হুকুকুল ইবাদ বা সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া সংক্রান্ত কর্তব্য পালন।

এই বিভাগ আহমদী কিশোর ও যুবকদের সৃষ্টজীবের সেবা করতে উদ্বুদ্ধ করে। সৃষ্ট-জীবের সেবা অল্পবিস্তর প্রত্যেকেই করে থাকে; কিন্তু এই বিভাগের কার্যক্রম এমন যে এর মাধ্যমে আহমদী যুবকরা মিলিতভাবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে এমনকি শত্রুও যদি বিপদগ্রস্থ হয়, তাকেও উদ্ধারের শিক্ষা লাভ করে। জন-সেবা ও পরোপকার যুবকদিগের ধ্যান, ধর্ম ও মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত করার জন্য এই বিভাগ সদা সচেষ্ট থাকে। যুবকগণ হাসপাতালে রোগীদের দেখতে যায়, প্রয়োজনে ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করে ও সান্তনা দেয়, মৃতের দাফন-কাজে সহায়তা করে, রেলষ্টেশনে বা মোটর ষ্ট্যাণ্ডে যাত্রীদের মাল উঠানামায় সাহায্য বা প্রয়োজনে ঠাণ্ডা পানির ব্যবস্থা করে, বন্যা-কবলিত ও মহামারী বিধ্বস্ত এলাকায় উদ্ধার কার্যে অংশ নেয় এবং প্রয়োজনে তাদের আশ্রয় দেয়।

এই বিভাগ আহমদী কিশোর ও যুবকদের 'প্রাথমিক চিকিৎসা' শিখানোর উদ্দেশ্যে স্বল্প মেয়াদী প্রাথমিক চিকিৎসার কোর্সের ব্যবস্থা করে যা তাদের উল্লিখিত সেবা-কার্যে সহায়ক হয়।

(৫) ওয়াকারে-আমল ঃ—যে সমস্ত বিত্তশালী ব্যক্তি নিজ হাতে কাজ করতে দ্বিধা-বোধ করে, প্রকারান্তরে তারা দাসত্ব-প্রথার প্রসার ঘটায়। এই ধরনের মন ও মানসিকতা জাতির জন্য মারাত্মক। দাসত্ব-প্রথার বিলুপ্তি ঘটানো ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য।

উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জনে আহমদী কিশোর ও যুবকরা লজ্জা ও দ্বিধাহীন চিত্তে এই বিভাগের কর্মসূচী অনুযায়ী সর্বপ্রকার কল্যাণমূলক কায়িক কাজে অংশ গ্রহণ করে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) বলেছেন, "যে সকল জাতি নিজের কাজ নিজেই করে নেয়, তারাই প্রতিযোগিতায় শীর্ষ-স্থান অধিকার করে।" তিনি আরও বলেছেন ঃ "বর্তমান যুগে যুবকরা যে সমস্ত কাজ সম্মান হানিকর মনে করে, তোমরা (আহমদী যুবকরা) তা প্রফুল্লতার সাথে সম্পাদন কর।"

(৬) তজনীদ ঃ—কোন সদস্যই যাতে তরবীয়ত, শিক্ষা, খেদমতে-খালক, ওকারে-আমল ইত্যাদি কাজ হতে বঞ্চিত না হয় তাই এই বিভাগ প্রতিটি সদস্য সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করে।

(৭) তালীম :— কুরআন পাকে বর্ণিত আছে : "প্রকৃত খোদাভীতি কেবল জ্ঞানী লোকদের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়।" অনুরূপভাবে হাদীস গ্রন্থে রয়েছে :

"বিদ্যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য।"

আসমানী শিক্ষা বিবর্জিত জাতি ধ্বংসের হাতিয়ার। এদিকে লক্ষ্য রেখে এই বিভাগের কর্মসূচীতে নিরক্ষর যুবকদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা, কুরআন ও ইহার অনুবাদ এবং অর্থসহ নামায শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই বিভাগের অধীনে আহাদীস, যুগ-ইমাম মসীহ মওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী এবং সিলসিলার অন্যান্য গ্রন্থাবলী পাঠের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এই বিভাগ কিশোর ও যুবকদের সুবক্তা হিসেবে গড়তে, এবং সুন্দর বাচন-ভঙ্গি শিক্ষা দেওয়ার জন্য বক্তৃতা অনুশীলনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। যুবকদের প্রবন্ধ লেখায় পারদর্শী করার জন্য সময় সময় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করাও এই বিভাগের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

(৮) ছানআত ও তেজারত :—যুবকদের মধ্যে ব্যবসা ও কারিগরী বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য এই বিভাগ নিয়োজিত। এই বিভাগ যুবকদের একাধিক কাজ শিখতে অনুপ্রাণিত করে যাতে বাড়তি শিক্ষালব্ধ কারিগরী জ্ঞান উপার্জনের পথকে প্রশস্ত করে।

(৯) ছেহতে জেসমানী :—এই বিভাগ আহমদী কিশোর ও যুবকদের খেলাধুলা ও ব্যায়ামের ব্যবস্থা করে এবং স্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়তা করে। নির্মল ও সহজসাধ্য খেলাধুলা, যেমন—ভলিবল, বাস্কেটবল, ফুটবল ইত্যাদি খেলার ব্যবস্থা করে।

(১০) ইসলাহ ও ইরশাদ :—"তকমীলে এশায়াতে হেদায়েত" বা ধর্মের পূর্ণ প্রচারে আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য এই বিভাগ যুবকদিগকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করে। এই বিভাগ যুবকদিগকে ধর্মীয় যুক্তি-প্রমাণাদি শিক্ষা দিয়ে থাকে। এই বিভাগ প্রচার-পত্র-পুস্তিকা প্রণয়ন, প্রকাশ ও প্রচারের কাজও করে থাকে।

(১১) তাহরীকে জদীদ ও ওয়াকফে জদীদ :—এই বিভাগ জামাতে আহমদীয়ার মূল পরিকল্পনার অংশ হিসাবে পৃথিবীতে ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণের জন্য যুবকদের নিজ জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এই প্রোগ্রাম সাদাসিদা অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতে অনুপ্রাণিত করে থাকে। ফলে যুবকগণ দেশের ভিতরে ও বাহিরে জামাতের প্রচার কার্যে জীবন ও সম্পদের কুরবানী দ্বারা অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

(১২) মজলিসে আতফালুল আহমদীয়া :—এই বিভাগ কিশোরদের ভবিষ্যতে উৎকৃষ্ট আহমদী হিসাবে গড়ার কাজে প্রয়োজনীয় তালীম ও তরবীয়তের ব্যবস্থা করে।

'বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া' সীমিত উপকরণ ও সামর্থ্য নিয়ে বিভিন্ন স্থানীয় মজলিসের মাধ্যমে উল্লিখিত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত রয়েছে। ইনশাআল্লাহ অদূর ভবিষ্যতে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কল্যাণময় ছোঁয়া পরিদৃষ্ট হবে এবং সকল মানুষ ইসলামের খেলাফতের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেবে, আল্লাহ করুন শীঘ্রই যেন তদ্রূপ হয়।

পরিশেষে যাবতীয় প্রশংসা এই বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহতা'লার।

কার্য-বিবরণী ঃ

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া

—মোঃ আবদুল জলিল, মোতামাদ (সাধারণ সম্পাদক)

আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলিফা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেছেনঃ "যুবকের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতিসমূহের সংশোধন হইতে পারে না।" এইজন্যই তিনি ১৯৩৮ সালে ঐশী প্রেরণায় ও ১৪০০ বছর আগের 'হিলফুল ফুজুল'-এর প্রতিচ্ছবিরূপে রুহানী জামাতের রুহানী কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত যুবকদের জন্য গঠন করেন 'মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া'। সকল আহমদী যুবক, কিশোর এবং শিশুদের সমন্বয়ে গঠিত এই মজলিস। পৃথিবীতে বহু স্বেচ্ছামূলক যুব-সংগঠন আছে। আদর্শের দিক থেকে, নৈতিক গুণাগুনের দিক থেকে, নিঃস্বার্থ সেবার দিক থেকে, শৃংঙ্খলার দিক থেকে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সমকক্ষ একটি সংগঠনও বিশ্বের কোথাও নাই। এই মজলিস গঠনের উদ্দেশ্য ঃ প্রত্যেক আহমদী যুবক যেন এমনভাবে তা'লীম ও তরবীয়ত প্রাপ্ত হয় যাতে তারাই ইসলামের জীবন্ত এবং মূর্তিমান আদর্শরূপে প্রতীয়মান হয়; লোকে যেন তাদেরকে দেখে বলতে বাধ্য হন যে, ইহারাই প্রকৃত মুসলমান। হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) নিজ জীবদ্দশাতেই এই যুব-সংগঠনকে এমনভাবে তা'লীম ও তরবীয়ত প্রদান করেন এবং এমন ছাঁচে ইহার কার্যক্রমকে বিন্যাস করেন যে, অর্ধ-শতাব্দী অতিক্রম না করতেই এই মজলিস বিশ্ব-ব্যাপী একটি পূর্ণ বৃক্ষের আকার ধারন করে যা আজ ফুলে ও ফলে সুশোভিত। এই মজলিসের সফলতার চাবি-কাঠি হলো এতায়াত বা আনুগত্য। যুবকদের আনুগত্যের শিক্ষা প্রদান করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—'যুবকদের মধ্যে নেযামের অর্থাৎ সংগঠনের প্রতি অনুবর্তিতার অভ্যাস সৃষ্টি কর, বরং এই উদ্দেশ্যকে সকল কিছুর উপরে স্থান দাও।' আহমদী যুবকগণ এই শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়েছেন। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে যেখানেই জামাতে আহমদীয়া কায়েম হয়েছে সেখানেই খোদ্দামুল আহমদীয়ার সংগঠনও কায়েম হয়েছে তেমনিভাবে বাংলাদেশেও এই মজলিস কায়েম আছে। আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও করমে দিনের পর দিন রুহানী কর্মসূচীর আওতায় তা'লীম ও তরবীয়তের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন মজলিস সমূহে অব্যাহত রয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশ মজলিস সমূহের অতি সংক্ষিপ্ত চিত্র পাঠকবৃন্দের কাছে তুলে ধরছি। আমাদের ঐকান্তিক দোওয়া এই যে, আমাদের অগ্র-যাত্রায় আল্লাহ্ তা'লা যেন তাঁর ফিরিস্তা দ্বারা আমাদেরকে সাহায্য করেন। বাংলাদেশে বর্তমানে ৬৫টি 'মোকামী মজলিস' বা স্থানীয় সংগঠন রয়েছে। দেশীয় কেন্দ্র হিসেবে ঢাকায় ইহার কার্যালয় রয়েছে এবং বিশ্ব-মজলিসের কেন্দ্র রাবওয়ায় রয়েছে।

তা'লীম ও তরবীয়ত :

স্থানীয় মজলিসগুলি ব্যক্তিগত ও জামাতগতভাবে খোদ্দাম ও আতফাল ভাইদের মধ্যে তা'লীম ও তরবীয়তের ব্যবস্থা করে থাকে। এছাড়া সাপ্তাহিক এবং মাসিক ক্লাশের মাধ্যমেও বিশেষ বিশেষ কর্মসূচীর অধীনে কুরআন, হাদীস, ধর্মীয় জ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতি বছর সপ্তাহব্যাপী এক কর্মসূচীর মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল খোদ্দাম ও আতফালের জন্য এক বিশেষ ক্লাশের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। আল্লাহ্-তায়ালার ফজলে বিগত বছরগুলিতে অত্যন্ত সফলতার সাথে উহা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইজতেমা (সম্মেলন) :

প্রতিবছর সেপ্টেম্বর অথবা অক্টোবর মাসে তিন দিন ব্যাপী মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং এতে বাংলাদেশের প্রায় সকল মজলিস হতে খোদ্দাম ও আতফাল যোগদান করে থাকেন। এই সকল ইজতেমায় তা'লীম-তরবিয়তী এবং তবলীগ সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া প্রতিবছর সালানা জলসার পর একদিনের জন্য কায়েদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মজলিসের কার্যবিবরণী, কাজের সুবিধা ও অসুবিধা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয় যার ফলে মজলিসের কাজ-কর্মের মানোন্নয়নের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। বর্তমান বছরে পৃথকভাবে 'কায়েদ সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ২২শে জুলাই। সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিতব্য ইজতেমার প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে 'কায়েদ সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ২৫টি মজলিসের কায়েদ, প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশ মজলিসের নাজেমগণ যোগদান করেন। বিভিন্ন মোকামী মজলিস সমূহেও বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গত বছর এবং এ বছর যে সকল মজলিসে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলে : ঢাকা, ময়মনসিংহ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, আহমদনগর, কটীয়াদি, তেজগাঁও, নারায়নগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও সুন্দরবন।

ইসলামের দিকে সকল মানুষকে আহ্বান করা, এবং ইসলামের পূর্ণ প্রচারই জামাতে আহমদীয়ার বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের প্রায় সকল মজলিস তবলীগের কাজে জড়িত। খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নিকট ইসলামের বাণী পৌছাইবার জন্য মজলিসে খোদ্দামুল আহদীয়ার সদস্যগণ সর্বদাই সচেষ্ট আছেন। সম্প্রতি পাবনা, তেজগাঁও, ময়মনসিংহসহ আরও কয়েকটি মজলিস খ্রীষ্টানদের মধ্যে প্রচারের ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহ্তায়ালার অশেষ ফজলে তার ভাল ফলাফল পাওয়া গেছে।

খেদমতে খালক :

'সৃষ্টির সেবা' না করলে মানুষ আল্লাহ্কে পাবে না। মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার একটি বিশেষ বিভাগ হলো 'খেদমতে খালক'। সুন্দরবন, নারায়ণগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, আহমদ

নগর সহ কয়েকটি মজলিস দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে বিন মূল্যে মানুষের সেবা করে আসছে। এছাড়া ব্যক্তিগত পর্যায়েও আমাদের খোদ্দাম ভ্রাতাগণ সাধ্যমত এ বিভাগের কাজ করে থাকেন।

সেহত ও জেসমানী :

স্বাস্থ্য বিভাগের অংশ হিসেবে বিভিন্ন মজলিস ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি স্বাস্থ্য সম্মত খেলাধূলায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। বার্ষিক ইজতেমার সময় প্রধানতঃ ভলিবল প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে।

এশায়াত :

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া এশায়াত বিভাগ সালানা জলসার মধ্যে প্রদর্শনীর মাধ্যমে ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রচারের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরার জন্য সুন্দর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে থাকে। পোষ্টার, ফেষ্টুন, ব্যানার ইত্যাদি দ্বারা জলসাকে সাজাতে খুবই সাহায্য করে। অন্যান্য জামাত সমূহেও বার্ষিক জলসার সময় প্রচার মূলক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

সফর ও জলসায় যোগদান :

বাংলাদেশের বিভিন্ন মজলিসের বাৎসরিক ইজতেমা এবং স্থানীয় জামাতের বার্ষিক জলসায় যোগদান করার জন্য জনাব নায়েব সদর, মোতামাদ বিভাগীয় কায়েদ জনাব এ, কে, রেজাউল করিম, জনাব এস, এ, নিজামী ও জনাব আবদুর রব, জেলা কায়েদ অধ্যাপক রাজীব উদ্দীন আহমদ, জনাব আবদুল হাদী ও জনাব ফুরহানুল হক মজলিসগুলিতে সফর করেন এবং স্থানীয় মজলিসের খোদ্দাম ও আতফাল ভাইদের মজলিসের কাজে উদ্বুদ্ধ করেন। এর ফলে মজলিসগুলি কাজে যথেষ্ট উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করে।

সেমিনার :

ঢাকা, তেজগাঁও, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, জামালপুর, খুলনা, আহমদনগর, শাহবাজপুর সহ বেশ কিছু মজলিস হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পুস্তকাদির উপর বিশেষ সেমিনার ও সভা করেন। ইহা ছাড়া 'মসীহ মওউদ দিবস,' 'মুসলেহ মওউদ দিবস' 'খেলাফত দিবস, উদযাপন করা হয়ে থাকে।

অর্থ বিভাগ :

বাংলাদেশ মজলিসের একটি অর্থ বিভাগ আছে। আল্লাহতায়ালার ফজলে বাজেট অনুযায়ী প্রায় চাঁদা আদায় হয়ে থাকে। মাসিক আয়ের শতকরা এক ভাগ (১%) মজলিসের চাঁদা দিতে হয় মজলিসের প্রত্যেক সদস্যকে। অবশ্য যারা অধ্যয়ন করেন তাদের বৎসরে মাত্র ৪'৬০ পয়সা চাঁদা দিতে হয় এবং বয়স অনুপাতে ৫ পয়সা, ১০ পয়সা অথবা ১৫ পয়সা হারে আতফালের চাঁদা। তালীম ও তরবিয়তী কার্যক্রম, ইজতেমা কার্যক্রম প্রভৃতি কার্যে এই আদায়কৃত চাঁদা ব্যয় হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মজলিস সমূহ হতে যে চাঁদা পাওয়া যায় তাহারা মজলিসের যাবতীয় খরচ নির্বাহ করা হয়।

পরিশেষে আমরা বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার জন্য সকলের নিকট খাস দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি যাতে আমরা আরো বেশী নিজেদেরকে দ্বীন ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত করতে পারি এবং মজলিসের সকল খোদ্দাম ও আতফাল যেন নিজেদের দায়িত্ব পুরাপুরি পালন করেন।

ঢাকা বিভাগীয় মজলিসের কার্য বিবরণী

(১৯৭৮-৭৯)

—এ, কে, রেজাউল করীম, বিভাগীয় কায়েদ

এ বছরের শুরুতেই আমার উপর ঢাকা বিভাগীয় কায়েদের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। রিপোর্টটা লেখার পূর্বে বন্ধুদের কাজ করার প্রেরণা যোগানোর জন্য বাংলাদেশ জামাতে আহ্‌মদীয়ার মোহতারম আমীর সাহেব আমাকে যে একটা কথা প্রায়ই বলে থাকেন সেটা তুলে ধরছি। সেটা হলো : "জামাতের তরফ থেকে কোন হুকুম এলে তা' পালন করার জন্য দাঁড়িয়ে যান। নিঃস্বার্থ মন নিয়ে দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার সাহায্য প্রার্থনা করুন—আল্লাহ যতটুকু চান ততটুকুই আপনার দ্বারা সাধিত হবে।" এ ছাড়াও কোন কোন বুযুর্গ বন্ধুর সাহায্য আমার জামাতি কাজ করার প্রেরণার উৎস হয়ে আছে ; তাঁদের কাছ থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ও তাঁর খলীফাগণের বহু অমৃতবাণী সমূহ জানতে পেরেছি। এবার আমি ঢাকা বিভাগের একটা সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী পেশ করছি। বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ঢাকা বিভাগে ১৪টি মজলিস রয়েছে। তন্মধ্যে তিনটি বড় মজলিস হলো ঢাকা, তেজগাঁ ও নারায়নগঞ্জ। ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া যেহেতু বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মজলিসের সরাসরি নিয়ন্ত্রনে কাজ করছে সেহেতু তার দায়িত্ব ও সুযোগ দুটোই অন্যদের চাইতে বেশী। প্রত্যেক মজলিসের একজন কায়েদ ও তাদের নিজস্ব মজলিসে আমেলা রয়েছে এবং তারা সবাই কেন্দ্রের নির্ধারিত নিয়ম বা দস্তুরে এসাসী মোতাবেক নিজ নিজ স্থানে কাজ করে যাচ্ছে। ময়মনসিংহ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া এ বছর তাদের স্থানীয় ইজতেমা করেছে। ঢাকা মজলিস 'ইয়াওমে ওয়ালেদাইন" পালন করেছে। তাছাড়া ঢাকা, তেজগাঁ, ময়মনসিংহ, জামালপুর ও নারায়ণগঞ্জ মজলিসে নিয়মিত সেমিনার ও কিছু কিছু উর্দু ক্লাশও হচ্ছে। এ সব কাজের নিগরানী করার জন্য এ বিভাগে দু'জন জেলা কায়েদ রয়েছেন। ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার বর্তমান জিলা কায়েদ জনাব বোরহানুল হক এবং ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও জামালপুর জেলার বর্তমান জিলা কায়েদ জনাব আহমদ তবশীর চৌধুরী।

বিভাগীয় কায়েদ হিসাবে আমি চলতি বছরের মে, জুন ও জুলাই মাসে নারায়ণগঞ্জ, তেজগাঁ, ময়মনসিংহ, কটিয়াদী, তেরগাতি ও বীরপাইকশা মজলিস পরিদর্শন করেছি। প্রায় সবগুলো মজলিসেই খোদ্দাম আতফাল ও আনসারুল্লাহর সম্মিলিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই সভাগুলোতে বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর বর্তমান নাজেমে আলা মোহতরম জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঞা সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। মজলিসগুলো পরিদর্শনকালীন এ সভাসমূহে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর বিশেষভাবে জোর দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছি :

(১) নিয়মিত মজলিসের চাঁদা আদায় ও উহা ঠিকমত কেন্দ্রে পাঠানো। (২) বা-জামাত নামাজ আদায়। (৩) হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সকল (বিশেষ করে বাংলায় অনূদিত) পুস্তকাবলী পাঠ। (৪) কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করা। (৫) জামাত কর্তৃক প্রকাশিত 'পাক্ষিক আহমদী' উত্তমরূপে পাঠ, (৬) অন্যান্য তা'লীমি প্রোগ্রাম গ্রহণ করা, (৭) কেন্দ্রে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠানো, (৮) প্রত্যেক খাদেমকে বক্তা বানানো ইত্যাদি।

অনেকবারই মুন্সীগঞ্জ, রেকাবী বাজার ও জামালপুর মজলিস পরিদর্শন করার প্রোগ্রাম করেছি কিন্তু জামাতের অন্যান্য কাজের চাপে তা হয়ে উঠেনি। তবে ভবিষ্যতে সবগুলো মজলিস পরিদর্শন করার ইচ্ছে আমার রয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, বিভাগীয় কায়েদের দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই আমি সবগুলো মজলিসকে তাদের বাজেট পাঠানোর জন্য পত্র লিখেছি। শুধু ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, তেজগাঁ, ময়মনসিংহ ও জামালপুর মজলিস সমূহ হতে এ ব্যাপারে পত্রের উত্তর পাওয়া গিয়েছে। মজলিসের সব চেয়ে অধিক চাঁদার বাজেট ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার। বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার চাঁদার সিংহভাগ যোগান দেয় ঢাকা মজলিস।

পরিশেষে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার কয়েকটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেছেন: "খোদ্দামুল আহমদীয়া কাসরে আহমদীয়ার ইট স্বরূপ।" তিনি আরো বলেছেন: "নওজোয়ান কোরবানী কী উত্তহ মাইয়ার পেশ কারে জিস দেখ কার লোগ শরমিন্দা হো।"

আল্লাহতায়ালা আমাদের হযরত মোসলেহ মাউদ (রাঃ)-এর পবিত্র নির্দেশাবলী অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দিন। খোদা আমাদের সকলের সকল কাজে হাফেজ, নাসের ও হাদী হউন। আমীন।

"নবীন সাইকেল মার্ট"

যাবতীয় সাইকেল ও রিক্‌শার পাইকারী, খুচরা ও যন্ত্রাংশের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

২০৬/১, বংশাল রোড, ঢাকা।

"চট্টগ্রাম বিভাগীয় মজলিসের কার্য্য বিবরণী

(১৯৭৮-৭৯)

—এস, এ, নিজামী, বিভাগীয় কায়েদ

চট্টগ্রাম বিভাগীয় মজলিসের সদর দপ্তর চট্টগ্রামেই অবস্থিত। এই বিভাগ চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা ও সিলেট এই পাঁচটি জেলা নিয়ে গঠিত। এই বিভাগে দুইজন জেলা কায়েদ রয়েছেন। তাঁদের একজন চট্টগ্রামেই আছেন এবং অপরজন রয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায়। এই বিভাগে ১৮টি ছোট-বড় মজলিস রয়েছে। উহাদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল :

১। চট্টগ্রাম, ২। ফাজিলপুর (নোয়াখালী), ৩। নূসরতাবাদ (চাঁদপুর), ৪। নন্দনপুর (কুমিল্লা), ৫। খড়মপুর, ৬। ক্রোড়া, ৭। বিষ্ণুপুর, ৮। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ৯। বাশারুখ, ১০। ঘাটুরা, ১১। নাটাই, ১২। জামালপুর (সিলেট), ১৩। তারুয়া, ১৪। শালগ্রাম, ১৫। ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ১৬। দুর্গারামপুর, ১৭। বড়গাঁ, (সিলেট) ও ১৮। শাহবাজপুর। উপরোক্ত মজলিস সমূহের মধ্যে খোদ্দামের সংখ্যার দিক থেকে চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, তারুয়া, ক্রোড়া, নন্দনপুর, ঘাটুরা, নাটাই বড় মজলিস এবং অন্যান্য মজলিস সমূহ আনুপাতিকভাবে কম সংখ্যক খোদ্দাম ও আতফাল নিয়ে গঠিত। চট্টগ্রাম জেলায় মজলিসের সংখ্যা একটি। নোয়াখালীতে ১টি, কুমিল্লা জেলায় ১৪টি এবং সিলেট জেলায় ২টি মজলিস রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনও কোন জামাত কায়েম হয়নি বিধায় সেখানে কোন মজলিস নেই।

এই বিভাগের মজলিস সমূহ যাতায়াতের দিক থেকে দুর-দুরান্তে অবস্থিত। কতক মজলিস সড়ক পথে সুবিধাজনক যোগাযোগস্থলে অবস্থিত, কতক পদব্রজে ও নদীপথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। ১৯৭৮-৭৯ সালের মধ্যে জেলা কায়েদ (চট্টগ্রাম, ও নোয়াখালী), কায়েদ (চট্টগ্রাম) ও বিভাগীয় মোতামাদ সহ আমি চট্টগ্রাম বিভাগের ৮টি মজলিস সফর করি এবং প্রত্যেক মজলিসে সাধারণ সভা আহ্বানের মধ্য দিয়ে খোদ্দাম ও আতফালদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে নসিহতমূলক বক্তৃতাদি প্রদান করি। সফরকৃত মজলিস সমূহ হচ্ছে নন্দনপুর, ক্রোড়া, খরমপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, নাটাই, ঘাটুরা এবং তারুয়া। সফর উপলক্ষে তারুয়া সালানা জলসা—৭৮ এ এই এলাকার সমস্ত খোদ্দামদের উদ্দেশ্যে সালানা জলসায় এবং জলসার পরে খোদ্দামদের সভায় তরবিয়তী ও সাংগঠনিক বক্তৃতা দান করি। সিলেটের জামালপুর মজলিস সফরকালে তথাকার মসজিদ নির্মাণের কাজ অসমাপ্ত থাকায় চট্টগ্রাম হতে বিশেষ আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে উক্ত মসজিদের নির্মাণকাজ সমাপ্ত করার

ব্যবস্থা করি। এ ছাড়া চিঠিপত্রের মারফত বিভাগের সকল মজলিসের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়ে থাকে। বিভাগের বেশ কিছু মজলিস হতে রীতিমত মাসিক রিপোর্ট পাওয়া যায়। এই সমস্ত মজলিস সমূহে রীতিমত সেমিনার, মাসিক সভা ; আতফালের তরবীয়তি ক্লাশ হয়ে থাকে ; অন্যান্য ছোট ছোট মজলিসগুলোকেও এ ধরনের কার্যক্রম চালু করা ও জারি রাখার জন্য হেদায়েত দেয়া হয়েছে। জেলা কায়েদের নিজস্ব আওতাধীন মজলিস সমূহে ঘন ঘন সফর করে মজলিস সমূহের খোদ্দাম, আতফাল ও ওহুদাদারদের সাথে দেখা সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে তাদের কার্যক্রমে অনুপ্রেরণা যোগাবার জন্য হেদায়েত দেয়া হয়েছে। প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে জেলা কায়েদ (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) বিভিন্ন মজলিসের কায়েদদের সঙ্গে করে মজলিস সমূহ পরিদর্শন করে থাকেন। কেন্দ্র হতে যে সমস্ত রুহানী কার্যক্রমের নির্দেশ প্রদান করা হয় তা যথাযথভাবে আমল করার জন্য বিভাগীয় অফিস হতে পত্র মারফত প্রত্যেক মজলিসের কায়েদ ও ওহুদাদার দেরকে বিশেষভাবে তাকিদ প্রদান করা হয়।

চট্টগ্রাম বিভাগে কর্মতৎপরতার দিক থেকে চট্টগ্রাম মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া শীর্ষস্থানে রয়েছে। এই মজলিস আল্লাহতায়ালার বিশেষ কৃপায় রাবওয়া হতে আগত ১৯৭৯ সালে ঢাকায় সালানা জলসায় অংশ গ্রহণকারী বুজুর্গানদের মারফত হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর তরফ হতে প্রদত্ত বিশেষ তোহ্ফা লাভে সমর্থ হয়। সমস্ত বাংলাদেশ সফরান্তে বুজুর্গানেরা চট্টগ্রাম মজলিসকেই এই তোহ্ফা প্রদান করেন। এর পর ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া ও নন্দনপুর মজলিস সমূহ বিশেষ কর্মতৎপর বলে প্রমাণ করেছে। আশা করি বিভাগের অন্যান্য মজলিস সমূহও তাদের শিথিলতা পরিহার পূর্বক কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসার জন্য সচেষ্ট হবে এবং তাদের উপর ন্যাস্ত গুরুভার বহনে সমর্থ হবে। (আমিন)

—০—

আধুনিক ও উৎকৃষ্টমানের বৈদ্যুতিক
তার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান

ন্যাশনাল কেবল ইণ্ডাষ্ট্রীজ

২৪, কলেজ রোড, চট্টগ্রাম ।

রাজশাহী বিভাগীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কার্য বিবরণী (১৯৭৮-৭৯)

– মোঃ আব্দুর রব, বিভাগীয় কায়েদ

রাজশাহী বিভাগের অধীনে নিম্নোক্ত স্থানে খোদ্দামুল আহমদীয়ার মজলিস রয়েছে :– ১। শ্যামপুর, ২। নীলফামারী, ৩। গাইবান্ধা, ৪। মাহিগঞ্জ (রংপুর), ৫। মহারাজপুর, ৬। বাঘামারা (রাজশাহী), ৭। নাটোর, ৮। রাজশাহী, ৯। আহমদ নগর ১০। হেলেঞ্চাকুড়ি, ১১। ভাতগাঁ ১২। দোহাণ্ডা ১৩। দিনাজপুর শহর ১৪। পাবনা এবং ১৫। কুষ্টিয়া। এই সকল মজলিসের মধ্যে ৬।৭টি মজলিসের সংগে খোদ্দামুল আহমদীয়ার তালীম ও তরবীয়তী কর্মসূচী এবং অন্যান্য বিষয়ে যোগাযোগ হয়ে থাকে। অন্যান্য মজলিস গুলোর সংগে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

মজলিসের কাজ-কর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য এই বিভাগে তিনজন জিলা কায়েদ রয়েছেন : (১) রংপুর ও বগুড়া জিলা—জনাব মাহবুবুর রহমান, (২) রাজশাহী ও দিনাজপুর জিলা—জনাব শামসুর রহমান এবং (৩) পাবনা ও কুষ্টিয়া—অধ্যাপক রাজীব উদ্দীন আহমদ।

বিগত ২-৫-৭৯ তারিখ থেকে আমি বিভাগীয় কায়েদ হিসাবে মনোনীত হয়েছি। ইতি-মধ্যে নিম্নোক্ত মজলিস সমূহ সফর করেছি : শ্যামপুর মজলিস, ভাতগাঁ, হেলেঞ্চাকুড়ি, দিনাজপুর শহর এবং মাহিগঞ্জ। এই সফরের ফলে মজলিসগুলোর কাজকর্মে অনেক উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। ইদানিং আহমদ নগর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই ইজতেমায় রাবওয়া হতে আগত জনাব রাজা নাসীর আহমদ সাহেব উপস্থিত ছিলেন। এই সকল মজলিসে নামায শিক্ষা, কুরআন করীম শিক্ষা, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর পুস্তকাদি অধ্যয়নের ব্যবস্থা রয়েছে।

'ওয়াকারে আমল'-এর ব্যবস্থা রয়েছে প্রায় সবগুলো মজলিসে। মসজিদ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, দুঃখীকে সাহায্য করা, ছোট-খাটো রাস্তা-ঘাট মেরামত করা ইত্যাদি কাজে বেশ কিছু খোদ্দাম অংশ নিয়েছে। এ ছাড়া স্থানীয় জামাতের জলসার সময় যাবতীয় কাজ কর্মের সিংহভাগ খোদ্দাম ও আতফাল ভাইগণই করে থাকেন।

অনুরূপভাবে খেলাধুলার ব্যাপারে খোদ্দাম ও আতফালের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ রয়েছে। 'খেদমতে খালক' বা সৃষ্টি সেবার দিকেও বন্ধুদের যথেষ্ট উৎসাহ রয়েছে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে অভ্যস্ত রয়েছে।

রাজশাহী বিভাগের সকল মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া তালীম ও তরবীয়তী কর্মসূচী অনুযায়ী আরো অনেক কিছু করার স্কোপ রয়েছে এবং এ ব্যাপারে আমরা খোদ্দাম ও আতফাল ভাইগণসহ স্থানীয় মজলিসের কায়েদদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে ভবিষ্যতে সুষ্ঠুভাবে মজলিসের কাজকর্ম সম্পাদিত হয় এবং নিয়মিতভাবে তারা মাসিক রিপোর্ট পেশ করেন।

খুলনা বিভাগীয় মজলিসের কার্য বিবরণী

—আবু কাওসার, বিভাগীয় কায়েদ

যশোহর, কুষ্টিয়া, বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনা জেলা লইয়া মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার খুলনা বিভাগ গঠিত। খুলনা বিভাগে অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান মজলিস সমূহ হইল ঃ খুলনা ও খালিশপুর শহর লইয়া খুলনা জামাত, নাসেরাবাদ (কুষ্টিয়া), উথলী (কুষ্টিয়া), চুয়াডাঙ্গা (কুষ্টিয়া), মনিরামপুর (যশোর), কুকুয়া (পটুয়াখালী) ও সুন্দরবন (খুলনা)। সুন্দরবন মজলিসই বিভাগের বড় মজলিস। দুইজন জেলা কায়েদের অধীনে এই বিভাগের মজলিসগুলি কাজ করিয়া যাইতেছে। ১৯৭৮-৭৯ সালে সুন্দরবন ও খুলনা মজলিসে বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া বাকী মজলিসগুলিতে যথারীতি সেমিনার, মোসলেহ মাউদ (রাঃ) দিবস, খেলাফত দিবস, সিরাতুননবী দিবস পালন করিয়া আসিতেছেন। বাংলাদেশ তালীম তরবিয়তী সংগঠন থেকে ১৯৭৮-৭৯ সালে যে তালিমী পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল, বিভাগের অধিকাংশ মজলিস তাতে যোগদান করে এবং কৃতকার্য্যতা লাভ করে। সুন্দরবন, খুলনা ও নাসেরাবাদ (কুষ্টিয়া) মজলিস খেদমতে খালকে অংশ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। খোদ্দামদের প্রচেষ্টায় সুন্দরবন মজলিস দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া বহু বছর ধরিয়া কাজ করিয়া আসিতেছে তাছাড়া তালীম ও তরবিয়তী ব্যাপারে প্রায় সবগুলি মজলিসই কমবেশী তৎপর আছে। কেন্দ্রীয় তালীমী পরীক্ষা ছাড়াও মজলিসগুলি নিজস্ব তালীমী পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। খেলাধুলার ব্যাপারে এই বিভাগ যথেষ্ট তৎপর। বিভিন্ন সাংগঠনিক ব্যাপারে এই বিভাগ যাহাতে আরও তৎপর হয় সেইজন্য পরম করুনাময় আল্লাহর কাছে দোয়া করি। আমীন।

ভাল মিষ্টির একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মিষ্টি ঘর

৫৪, কাতালগঞ্জ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ২০৬৪৯৭

ওফাতে মসিহ ও নজুলে মসিহ

—আল-হাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী

আখেরী জমানায় আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসিহ নবীউল্লাহ সম্বন্ধে কয়েকটি হাদিস হল :—

(১) "ইউশিকু মান আশা মিনকুম আঁই-ইয়ালকা ঈসাব্‌না মারইয়ামা ইমামান মাহদীয়ান ওয়া হাকামান আদ্‌লান ফা ইয়াকছিরুছ ছালীবা ওয়া ইয়াকতুলুল খিঞ্জিরা ওয়া ইয়াযাউল হারব্‌", অর্থাৎ—ঐ সময় যারা জীবিত থাকবে তারা ঈসা ইবনে মরিয়ম রূপে ইমাম মাহদীকে সুমীমাংসাকারীরূপে আসতে দেখবে, তিনি ক্রুশ ভঙ্গ করবেন, শূকর বধ করবেন এবং যুদ্ধ রহিত করবেন (মছনদ আহমদ' জিলদ ২, পৃষ্ঠা ৪১১)।

(২) "কাইফা তাহলিকু উম্মাতুন আনা ফি আউয়ালেহা ওয়াল মাছিহু ফি আখেরেহা" অর্থাৎ, কি করে ধ্বংস হবে এই উম্মত যার প্রথম দিকে আমি রয়েছি এবং শেষ দিকে মসিহ রয়েছেন (মেশকাত ও জামে উছ ছগীর, জিলদ ২, পৃঃ ১০৬)

(৩) "কাইফা আনতুম ইজা নাজালাবনু মারইয়ামা ফিকুম ওয়া ইমামুকুম মিনকুম" অর্থাৎ, কেমন হবে তখন যখন ইবনে মরিয়ম নাজিল হবেন তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের ইমাম হয়ে (বুখারী)।

(৪) "লা আল মাহদিউ ইল্লা ঈসা ইবনু মারইয়াম" অর্থাৎ—প্রতিশ্রুত ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতিরেকে অন্য কোন মাহদী নাই (ইবনে মাজা, ৩০২ পৃঃ)

এ ধরনের হাদিসগুলি পাঠ করে একথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে মহানবী (সাঃ) এই উম্মতের মধ্যে একজন প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমনের সুসংবাদ দিয়ে গিয়েছেন। তিনি মাহদী এবং মসিহরূপে আগমন করবেন। শেষযুগে তিনিই ইসলামের কর্ণধার বা ইমাম হবেন, তিনি সকল সমস্যার সুমীমাংসা করে সকল প্রকার অশান্তির অবসান ঘটিয়ে ইসলামকে সমস্ত জগতে জয়যুক্ত করবেন। এই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমন সম্বন্ধে সকল মুসলমানই একমত। তবে তাঁর সত্য পরিচয় নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বেশ কিছু ইখতেলাফ রয়েছে। আহমদী জামাতের মতে এই প্রতিশ্রুত মসিহ ও মাহদী একই ব্যক্তি (ইবনে মাজা ও আহমদের হাদিসেও তাই বলা হয়েছে) যিনি এই উম্মতের মধ্য হতেই তাদের ইমামরূপে আবির্ভূত হবেন। অপরদিকে গয়ের আহমদীদের ধারনা হল এই মসিহ এবং মাহদী ভিন্ন দুই ব্যক্তি। মাহদী এই উম্মত থেকে হবেন। কেননা তাদের ধারনা বণি ইস্রায়লীর ঈসা মসিহ (আঃ) সশরীরে জীবিত অবস্থায় আকাশে অবস্থান করছেন। এব্যাপারে আহমদীদের দাবী হল ঈসা (আঃ) স্বাভাবিক মৃত্যু লাভ করেছেন। আর যেহেতু ইসলাম পুণর্জন্ম

স্বীকার করেনা অতএব সেই মৃত ঈসা (আঃ)-এর পুনরাগমণের কোন প্রশ্নই ওঠে না। প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদীই জ্ঞানে ও গুণে ঈসার অনুরূপ হবেন বলে রূপকভাবে তাঁকে মসিহ ইবনে মরিয়ম বলা হয়েছে। আমরা এখানে অতি সংক্ষেপে এসম্বন্ধে কিছু দলিল উপস্থাপন করব।

ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর প্রমাণ ঃ

(১) "ওমা জায়ালনা লি বাশারিম মিন কাবলিকাল খুলদা আফা ইন্মিত্তা ফাহুমুল খালিদুন" অর্থ – আর (হে মোহাম্মদ) তোমার পূর্বে কোন মানুষকেই আমি অস্বাভাবিক দীর্ঘায়ু দান করিনি, অথচ তুমি মরে যাবে আর অন্যেরা দীর্ঘদিন জীবিত থাকবে (এটা কি করে সম্ভব)? (সুরা আম্বিয়া, ৩য় রুকু)। এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, মহানবী (সাঃ)-এর পূর্বেও কাউকে অস্বাভাবিক দীর্ঘায়ু দান করা হয়নি এবং তাঁর পরেও কেউ অস্বাভাবিক দীর্ঘায়ু লাভ করবেনা। যারা ঈসা (আঃ)-এর অস্বাভাবিক দীর্ঘ জীবন লাভের বিশ্বাস পোষণ করেন এই আয়াত তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসকে খণ্ডন করছে।

(২) "ওমা জায়ালনাহুম জাছাদাল লা ইয়াকুলুনাত তায়ামা ওমা কানু খালিদিন" অর্থ – আল্লাহ্ তাঁর রসুলদেরকে এমনকি কোন মানুষকে এমন দেহ দেন নাই যে তারা না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। এছাড়া এই দেহ নিয়ে দীর্ঘকাল জীবিত থাকাও সম্ভব নয় (সুরা আম্বিয়া, ১ম রুকু)। অতএব যারা হাজার হাজার বৎসর থেকে না খেয়ে ঈসা (আঃ) বেঁচে আছেন বলে ধারনা রাখেন এই আয়াত তাদের সেই ধারনাকে মিথ্যা প্রমাণ করছে। প্রশ্ন উঠতে পারে আল্লাহতায়ালা কি আকাশে ঈসা (আঃ)-কে খাদ্য দিতে পারেন না? এর উত্তর আমরা নিম্ন বর্ণিত আয়াতে জানতে পারি ;

(৩) "ওয়া উম্মুহু ছিদ্দীকাতুন কানা ইয়াকুলানিত তায়ামা" অর্থ (ঈসার) মা একজন সাধ্বী রমণী ছিল। এরা উভয়েই (ঈসা ও মরিয়ম) খাদ্য ভক্ষণ করত (সুরা মায়দা, ১০ম রুকু)। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, ঈসা (আঃ) ও তাঁর মা কোন এককালে খাবার খেতেন, অর্থাৎ এখন আর খান না।

(৪) "ওয়া নুয়াম্মিরহু নুনাক্কিসহু ফিল খালকে" অর্থ আর বয়স বেশী হলে মানুষ অত্যন্ত নাকিস বা দৈহিক দিক দিয়ে অত্যন্ত দুর্বল ও অযোগ্য হয়ে যায় (সুরা ইয়াসিন)। অতএব হাজার হাজার বৎসরের বৃদ্ধ এক নাকিস ব্যক্তি কি করে এই উম্মতের নেতৃত্ব করবেন ?

(৫) "ওয়া আওছানি বিছছালাতি ওয়ায যাকাতি মা দুমতু হাইয়া, অর্থ – (ঈসা বলছেন) যতদিন আমি জীবিত থাকি ততদিন নামায পড়তে ও যাকাত দিতে আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন (সুরা মরিয়ম, ২ রুকু)। প্রশ্ন ঃ তর্কের ছলে নামায পড়া মেনে নিলেও আকাশে থেকে যাকাত দেওয়া কি সম্ভব ?

(৬) "ওমা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাছুলুন কাদ খালাত মিন কাবলিহির রুছুল" অর্থ—মোহাম্মদ (সাঃ) রসুল ব্যতিরেকে অন্য কিছু নন, তাঁর পূর্বের সব রসুলই মৃত্যু লাভ করে গত হয়ে গেছেন (সুরা আল ইমরান, ১৫ রুকু)। অনেকে বলেছেন, এখানে 'খালাত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ 'গত হওয়া', মৃত্যু নয়। এর উত্তরে জেনে রাখা দরকার যে, কোরআনে অন্যত্র ঈসা (আঃ)-এর পূর্ববর্তী সকল রসুলের জন্যই অনুরূপ 'খালাত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে (দেখুন সুরা মায়েদা, ১০ম রুকু) এখানে সকলেই এই 'খালাত' দ্বারা ঈসা (আঃ)-এর পূর্ববর্তী সকল রসুলের মৃত্যুই বুঝে থাকেন। আরবী ভাষার সর্ববৃহৎ অভিধান তাজুল উরুছেও "খালা ফলানুন" বলতে কোন ব্যক্তির মৃত্যুকেই বুঝানো হয়েছে। সহি বোখারী ২য় খণ্ডে আছে, মহানবী (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর আল ইমরানের এই আয়াত পাঠ করে হযরত আবু বকর (রাঃ) জনসমক্ষে ঘোষণা করেন, "মান কানা মিনকুম ইয়াবুদু মোহাম্মাদান ফাকাদ মাতা ওয়া মান কানা ইয়াবুদুল্লাহা ফাইন্নাল্লাহা হাইউন লা ইয়ামুতু" অর্থাৎ মোহাম্মদ (সাঃ) পূর্ববর্তী রসুলগণের মতই মৃত্যুলাভ করে গত হয়ে গেলেন ; অতএব যারা তাঁর এবাদত করতো তারা জেনে নাও যে তিনি মরে গেছেন, আর যারা আল্লাহর এবাদত কর তারা জেনে রাখ একমাত্র আল্লাহই চিরস্থায়ী, তিনি কখনো মরবেন না।

(৭) "ওয়াল্লাজীনা ইয়াদউনা মিনদুনিল্লাহি লা ইয়াখলুকুনা শাইয়াও ওয়াহুম ইউখলাকুন আমওয়াতুন গায়রু আহইয়াইন" অর্থ—ওরা খোদার পরিবর্তে যাদেরকে আহ্বান করে থাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট, ওরা জীবিত নয়, মৃত (সুরা নহল, ৩য় রুকু)। অতএব খ্রীষ্টানদের "অন্যতম খোদা" ঈসা (আঃ) যে মৃত তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

(৮) "মা কুলতু লাহুম ইল্লা মা আমারতানি বিহি আনি বুদুল্লাহা রাব্বি ওয়া রাব্বাকুম ওয়া কুনতু আলাইহিম শাহিদাম মা দুমতু ফিহিম ফালাম্মা তাওয়াফ ফাইতানী কুনতা আনতার রাকীবা আলাইহিম।" অর্থ—(ইসা (আঃ) বলছেন) আমি তাই প্রচার করেছিলাম যা প্রচার করতে তুমি (আল্লাহ) আমাকে আদেশ করেছিলে, অর্থাৎ উপাসনা কর আল্লাহর যিনি আমার এবং তোমাদের প্রভু এবং এই বিষয়ে আমি সাক্ষী ছিলাম যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, এরপর তুমি যখন আমাকে মৃত্যু দিয়ে দিলে তখন থেকে তুমিই তাদের পর্যবেক্ষক (সুরা মায়দা, শেষ রুকু)। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ঈসা (আঃ) যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁর শিষ্যরা তৌহিদের উপর কায়েম ছিল।

(৯) "লাকাদ কাফারাল্লাজীনা কালু ইন্নাল্লাহা ছালিছু ছালাছাতিন।" অর্থ—বর্তমান খ্রীষ্টানরা যারা যীশুর শিক্ষায় অবিশ্বাসী হয়ে গিয়েছে তারা বলে আল্লাহ হলেন তিনের মধ্যে তৃতীয়। অর্থাৎ—পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই তিন খোদায় বিশ্বাস করে ওরা ঈসার

তৌহিদ বাণী "একমাত্র আল্লাহ (যিনি) আমার এবং তোমাদেরও প্রভু" থেকে সরে গিয়ে কাফের হয়ে গিয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর জবাব থেকে জানা যায় যে, খ্রীষ্টানদের এই বিকৃতি তাঁর ওফাতের পর হয়েছে, কেননা তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন যে ওরা তৌহিদের উপর কায়েম ছিল তার সাক্ষী ছিলেন স্বয়ং তিনি। অতএব কোরআনের এইসব আয়াত দ্বারাও এবং বর্তমান খ্রীষ্টানদের বিকৃতি লক্ষ্য করলে ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুই প্রমাণিত হয়।

(১০) "ইয়া ঈসা ইন্নি মুতাওয়াফফিকা ওয়া রাফেউকা ইলাইয়া।" অর্থ—(আল্লাহ বলছেন) হে ঈসা! আমি তোমাকে মৃত্যু দেব এবং এরপর আমার পানে উর্দ্ধারোহণ করব (সুরা আল ইমরান, ৬ রুকু)। এখানে আল্লাহতায়ালা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে প্রথমে ঈসার মৃত্যু হবে, তারপর তার 'রাফা' হবে। সুরা নেছার ২২ রুকুতে আছে ঈসা (আঃ)-এর রাফা' হয়ে গিয়েছে। অতএব আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মৃত্যুর পরই যে তাঁর 'রাফা' হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এখানে এও উল্লেখযোগ্য যে, বর্ণিত আয়াতের 'মুতাওয়াফ্ফিকা' শব্দের অর্থ করে অনেকে বিষয়টিকে নিজের খেয়াল খুশী মত অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিতে চায়: কিন্তু সহি বোখারী কিতাবুত তফসীরে রসুল করীম (সাঃ)-এর চাচাত ভাই যাঁকে স্বয়ং রসুল করীম (সাঃ) কোরআনের সমঝদার হিসেবে সার্টিফিকেট দিয়ে গিয়েছেন সেই ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "মুতাওয়াফফিকা আই মুমিতুকা" অর্থাৎ মুতাওয়াফফিকা অর্থ মৃত্যু দিব। আরবী ভাষায় সর্বত্র অনুরূপ ক্ষেত্রে "মুতাওয়াফফিকা" মৃত্যু অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা ঘোষণা করেছেন যে, যদি রাত্রি বা নিদ্রার সম্পর্ক বিদ্যমান না থাকে এবং আল্লাহ্ কর্তা হন তা হলে 'তাওয়াফফি' শব্দের অর্থ আরবী সাহিত্যে যদি মৃত্যু ব্যতিরেকে অন্য কিছু কেউ দেখাতে পারেন তাহলে তাকে সহস্র টাকা পুরস্কার দেয়া হবে ('ইযালায়ে আওহাম, ৩৭৫ পৃঃ)

পবিত্র কোরআনে ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু সম্বন্ধে এ ধরনের আরো বহু আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। স্থানাভাবে সেগুলি এখানে উপস্থাপন করা সম্ভব হল না। হাদিসেও হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর অনেক স্পষ্ট উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এক জায়গায় আছে, "লাও কানা মুসা ওয়া ঈসা হাইয়াইনি লামা ওয়াসিয়াহুমা ইল্লাত তিবারী" অর্থাৎ মহানবী (সাঃ) বলছেন, যদি মুসা ও ঈসা আজও জীবিত থাকতেন আমার অনুসরণ ব্যতিরেকে তাঁদেরও কোন গতি ছিল না (ইবনে কাছির, জিলদ ২, পৃঃ ২৪৪)। অন্যত্র বলেছেন, "আন্না ঈসা ইবনে মারইয়ামা আশা ইশরিণা মিয়াতা ওয়া ছানাতিন" অর্থাৎ—ঈস (আঃ) একশত বিশ বছর জীবিত ছিলেন (তিবরানী, কনজুল উম্মাল, জিলদ ৬, মোয়াহিবুদ্দুনিয়া, ১ম খণ্ড ৪২ পৃঃ)। এই হাদিস হযরত ফাতেমা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া যিনি ইস্রাইলীয় মসিহ এবং আখেরী জমানায় আগমনকারী মোহাম্মদী মসিহ যে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই ব্যক্তি সে

বিষয়েও রসুল করীম (সাঃ) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে গেছেন। তিনি এক কাশফে মুসা (আঃ)-এর সঙ্গে ঈসাকে (আঃ) দেখেছেন, যাঁর গায়ের রং লাল, কেশ কুঁকড়ানো ও বক্ষ প্রশস্ত ছিল (বোখারী, জিলদ ২)। অন্য এক রুইয়াতে তিনি দাজ্জাল হন্তা মসিহ নবী-উল্লাহ্‌কে দেখেছেন। এই মসিহ্‌র গায়ের রং গোধুম, মাথার কেশ সরল এবং লম্বা ছিল (বোখারী, কিতাবুল ফিতান, বাব জিকরিদ দাজ্জাল)। এই দুই বর্ণনায় ইস্রায়লীয় মসিহ ও মোহাম্মদীয় মসিহর সম্পূর্ণ পৃথক হুলিয়া বর্ণনা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারেঃ আখেরী জমানার মসিহকে ঈসা ইবনে মরিয়ম কেন বলা হল? এর উত্তরে ইমাম সিরাজ উদ্দীনের এই অভিমতটিই যথেষ্ট মনে করি। তিনি লিখেছেন 'নজুলে ঈসা (আঃ) দ্বারা এমন এক ব্যক্তির আগমন বুঝায় যিনি কল্যাণ ও প্রকৃতিগত কারণে হযরত ঈসার (আঃ) অনুরূপ হবেন (খারিদাতুল আজায়েব ও ফরিদাতুল আগারেব, ২১৪ পৃঃ)। অনুরূপ তফসীর-কাশশাফেও আছেঃ মরিয়ম ও ইবনে মরিয়ম বলতে মরিয়ম ও ঈসার সিফত প্রাপ্ত লোককে বুঝায়"। (জিলদ ১, পৃঃ ৩১২)। আকমালুদ্দীন এবং বেহারুল আনওয়ার নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে আরো স্পষ্টভাবে আছে, "আল মাহদী আশবাহুন্নাছা বি ঈসাবনে মারইয়ামা খালকান ওয়া খুলকান" অর্থাৎ—প্রতিশ্রুত মাহদী আকৃতি ও প্রকৃতিগতভাবে ঈসা ইবনে মরিয়মের মত হবেন। আর এজন্যই বর্তমান যুগের প্রতিশ্রুত মসিহ হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-এর কাছে আল্লাহতায়ালার এক বাণী হল, "আনতা আশাদ্দু মুনাছাবাতান বি-ঈসাবনে মারইয়ামা ওয়া আশবাহুন্নাছে বিহি খুলুকান ওয়া খালকান জামানান "অর্থাৎ—আকৃতি, প্রকৃতি এবং যুগের দিক দিয়ে ঈসা ইবনে মরিয়মের সঙ্গে তোমার সব চাইতে বেশী মিল রয়েছে (ইজালায়ে আওহাম, ১২৪ পৃঃ)।

এই বিভ্রান্তির উৎস কোথায়?

ঈসাকে (আঃ) আকাশে জীবিত রাখার ভ্রান্ত বিশ্বাসটি সম্পূর্ণরূপে একটি দাজ্জালী চক্রান্ত। খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থে আছে, যীশু সশরীরে জীবিত অবস্থায় আকাশে অবস্থান করছেন। তিনি শেষ যুগে আবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন। কালক্রমে খ্রীষ্টানদের এই বিশ্বাসটি ধীরে ধীরে মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। এব্যাপারে মুসলিম পণ্ডিতেরাও তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন, ঈসা (আঃ)-এর আকাশে যাওয়া এবং এখনো জীবিত থাকার বিশ্বাস খৃষ্টানদের দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। (ফতুহুল বয়ান, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৯)। খৃষ্টান পাদ্রীরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে তাদের ধর্মমত প্রচারের পথকে সুগম করার উদ্দেশ্যে হাদিসে বর্ণিত "ঈসা ইবনে মরিয়মের" শেষ জমানায় আগমনকে মূলধন করে 'রাফা' 'নজুল' শব্দ দু'টিকে অবলম্বন করে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস মুসলমানদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। তারা বুঝতে থাকে যে, 'রাফা' শব্দ দ্বারা ঈসার (আঃ) আকাশে যাওয়া

বুঝায় এবং নাজিল শব্দ দ্বারা তাঁর পুণরায় আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসাই প্রমাণ করে। অথচ আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্র জানেন 'রাফা' দ্বারা কখনো শুধু দৈহিক ভাবে আকাশে উঠান বুঝায় না। বরং রাফা দ্বারা আধ্যাত্মিকভাবে উন্নীত হওয়াকে বুঝিয়ে থাকে। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে এর বহু নজীর বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহতায়ালার এক নাম 'রাফিউদ্দারাজাত' অর্থাৎ যিনি মানুষের পদমর্যাদাকে 'রাফা' বা উন্নীত করে থাকেন। প্রত্যেক নবী এবং মোমেনেরই নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে রাফা বা উর্দ্ধারোহণ হয়ে থাকে। (সুরা বাকারা ৩য় পারা) মি'রাজকালে মহানবী (সাঃ) যখন মুসা নবীকেও অতিক্রম করে যান তখন মুসা (আঃ) বলেছিলেন, "রাব্বি লাম আজুন্নু আন ইউরফা আলাইয় আহাদুন" অর্থাৎ—হে প্রভু! আমিতো ভাবতেই পারিনি যে, আমার উর্দ্ধেও কারো রাফা হবে (বোখারী)। এখানে মুসা (আঃ)-এর রাফার উর্দ্ধেও মহানবী (সাঃ)-এর রাফার কথা বর্ণিত হয়েছে। অতএব রাফা শুধু ঈসারই (আঃ) নয় মুসারও (আঃ) হয়েছিল, মহানবী (সাঃ)এর হয়েছিল। এক কথায় নবী মাত্রেরই যোগ্যতানুসারে রাফা হয়েছে। মি'রাজের বর্ণনা থেকে জানা যায় ঈসা (আঃ)-এর শুধু দ্বিতীয় স্তরে মুসা (আঃ)-এর রাফা ষষ্ঠ স্তরে এবং মহানবীর (সাঃ)-এর চরম স্তরে হয়েছিল। তেমনি সহি হাদিসেও আছে, 'ওমা তাওয়া যাওয়া আহাদুন লিল্লাহে ইল্লা রাফা আল্লাহু" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছে বিনয়ী ব্যক্তিগণকে আল্লাহ্‌তায়ালা রাফা বা উন্নীত করে থাকেন (মুসলিম)। অতএব, ঈসা (আঃ)-এর জন্য ব্যবহৃত "বাররাফা হুয়াল্লাহু ইলাইহি" দ্বারা কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টিরই সুযোগ নেই। অনুরূপ 'নজুল' শব্দ দ্বারাও আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া বুঝায় না। কোরআন শরীফে লোহা এবং পোশাক অবতীর্ণ হয়েছে বলে বর্ণিত হয়েছে (দেখুন সুরা হাদিদ ও আরাফ)। মহানবী (সাঃ) সম্বন্ধে ও এই নজুল শব্দ নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কোন কারণ থাকতে পারে না। আরবীতে মোসাফিরের জন্যও এই নাজিল শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাই মোসাফিরের অবতরন স্থলকে 'মনজিল' বলা হয়।

বর্তমান যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আবির্ভূত হয়ে দাজ্জালের এই সব চক্রান্ত ভেলকী বাজীর মুল উৎপাটন করে কোরআন তথা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে জগতের সামনে উদ্ঘাটিত করেছেন। আসুন আমরা তাঁর ভাষায় প্রার্থনা করি—

"ইয়া রাব্বি আহমাদুন ইয়া ইলাহা মুহাম্মাদীন ইহিম ই াদাকা মিন ছুমুমি দুখানিহিম, ইয়া রাব্বি আরিনি ইয়াওমে কাছরে ছালিবিহিম ইয়া রাব্বি ছাল্লিতনি আলা জুদরানিহিম।

অর্থাৎ—হে আহমদের প্রভু, মোহাম্মদের খোদা! তোমার বান্দাদেরকে এদের (খৃষ্টানদের) ধুম্রজাল থেকে রক্ষা কর। হে আমার প্রভু, আমাকে সেই দিন দেখাও যেদিন ক্রুশ সম্পূর্ণ রূপে ভেঙ্গে যাবে এবং হে প্রভু আমার! এদের ভিত্তিস্থলে ও গৃহাভ্যন্তরে আমাকে আধিপত্য দান কর। আমীন!

—০—

যীশুখৃষ্ট ক্রুশে মরেন নাই—বাইবেলের সাক্ষ্য

—মাযহারুল হক

যীশুখৃষ্ট অর্থাৎ হযরত মসিহ্ নাসেরী (আঃ) আল্লাহতালার নবী ছিলেন। তাঁর সম্পর্ক দুনিয়ার তিনটি বড় 'আহলে কিতাব' কওম অর্থাৎ ইহুদী, নাসারা (খ্রীষ্টান) এবং মুসলমানদের সাথে রয়েছে।

প্রায় দুই হাজার বৎসর আগে বনি ইস্রাইল কুলের হারানো মেষকে খুঁজে একত্র করার এবং তৌরাতের ব্যবস্থাকে পূর্ণ করার প্রধান উদ্দেশ্যে তিনি প্রেরিত হন। বণি-ইস্রাইলের মোট বারটি গোত্রের দশটি গোত্রকে সম্রাট নেবুচাডনেজার বন্দী করে তার দেশ ব্যাবিলনে নিয়ে যায়। মাত্র দুটি গোত্র মসিহের সময়ে ফিলিস্তীনেই থেকে গিয়েছিলো। কিন্তু তিনি বলতেন: "আমি শুধু ইস্রাইল কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারো নিকট প্রেরিত হই নাই" (মথি ১৫ : ২৪)। অথচ ফিলিস্তীনের স্থানীয় দুইটি গোত্রের মধ্যেই তাঁর আবির্ভাব হয় এবং তাদেরকে ঈমান আনার জন্য তিনি আহ্বানও করেন।

আপাতঃ দৃষ্টিতে মসিহ্ নাসেরী (আঃ)-এর উক্ত দাবী এবং বাইবেলে বর্ণিত তাঁর জীবনের কর্মধারা পরস্পর বিরোধি মনে হয়, কিন্তু দুটি কথাই ঠিক। কারণ বণি ইস্রায়েলদের বারোটি গোত্রই আধ্যাত্মিকভাবে হারিয়ে গিয়েছিল, যার মধ্যে দশটি দৈহিকভাবেও যেরুযালেম ত্যাগ করেছিল। আসলে মসিহ্ একথা জানতেন যে, ইস্রাইলের দুইট স্থানীয় গোত্রের কতিপয় লোকজন ছাড়া কেহ তার উপর ঈমান আনবে না এবং লানছিত ও আজাব প্রাপ্ত হবে (মথি ২৩ : ৩৭-৩৯) তাই তিনি নিজেকে ইস্রাইলের হারানো মেষের সাথেই পরিচয় দিতেন। আসলে ফিলিস্তিনে অবস্থানকারী বনি ইস্রাইলদের দুটি গোত্রের প্রতি তাঁর আবির্ভাব "ইনযারী" (সতর্ক করণ মূলক) ছিল এবং "ওমা কুন্না মুয়াজ্জেবিনা হাত্তা নাবয়াসা রাসুলা '—আয়াত অনুযায়ী 'ইতমামে হুজ্জতের' জন্য ছিল।

মসিহের আবির্ভাবের পর স্থানীয় ইহুদীরা তাঁকে মানলো না। তাদের বিশ্বাস ছিল তৌরাতে বর্ণিত বণি ইস্রাইলদের প্রতিশ্রুত মসিহের আগমণ 'এলিয়' (ইলিয়াস) ভাববাদীর পরে হবে (মালাকি ৪ : ৫)। এলিয় নবী তৌরাতের বর্ণনা অনুযায়ী রথ সহ জীবিত আকাশে উঠে গিয়েছিলেন। (২-রাজাবলী ২ : ১১) সুতরাং আকাশ থেকে তাঁর পুণরাগমন যখন হয় নাই, তখন প্রতিশ্রুত মসিহ ও আসতে পারেন না কিন্তু হযরত মসিহ ইহুদীদের পরিস্কার ভাবে বলে দিয়েছিলেন যে, 'তোমরা যদি গ্রহণ করতে সম্মত হও তবে জানবে যোহনই এলিয়' (মথী ১১ : ১৪)। কিন্তু ইহুদীরা হযরত মসিহের এই ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারলেন না। তাদের ধারনায় 'এলিয়' স্বয়ং আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন—অন্য কোন ব্যক্তি

এলিয়ের রূপ ধরে আসবে না। মরিয়ম-পুত্র মসিহ একজন প্রতারক মাত্র।' সুতরাং প্রথমতঃ তারা মসিহকে নিজেরাই হত্যা করার চেষ্টা করে (যোহন ৫ : ১৮) কিন্তু মসিহের সমর্থক এবং আইনের ভয়ে যখন তারা তাঁকে হত্যা করতে অসমর্থ হয় (~~লুক, ৭ : ৩৬~~ মথি ২১:৪৬) তখন ইহুদী আলেমগণ বিভিন্ন ফিরকার গুরুদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র করেন (মথি ২৭ : ১) এবং মসিহকে রাষ্ট্র বিদ্রোহীর অভিযোগে পিলাতের আদালতে বিচারের জন্য হাজির করেন (লুক ২৩ : ১-২)। আদালতেও তারা তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে নাই। কিন্তু একথা জানা সত্বেও যে মসিহ নির্দোষ ছিলেন, পিলাত ইহুদী জনগণের, বিশেষ করে আলেমদের চাপে পড়ে তাঁকে ক্রুশের মৃত্যুর শাস্তি দিতে বাধ্য হয় (মথি ২৭ : ২২-২৬)।

কিন্তু মসিহ ক্রুশ বিদ্ধ হওয়া সত্বেও ক্রুশে প্রাণ ত্যাগ করেন নাই—করতে পারেন না। কেননা তাঁর নিজ ভবিষ্যদ্বাণী (মথি ১২ : ৩৯—৪০) অনুযায়ী আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে ক্রুশের লান্ছিত মৃত্যু থেকে উদ্ধার করেছিলেন এবং বাইবেলে বর্ণিত উক্তি দ্বারাই দিবালোকের ন্যায় এই সত্যটি প্রমাণিত হয়।

মসিহের সাথে ইহুদীদের কোন সম্পত্তি নিয়ে বা ব্যক্তিগতভাবে কোন ঝগড়া ছিল না, যার জন্য তাঁকে তারা হত্যা করতে চাইতো। বরং তাদের নিজের ভ্রান্ত ধারণার দরুন তারা তাঁকে একজন মিথ্যা ভাববাদী ও প্রতারক মনে করতো, এবং তৌরাতের শাস্তি (দ্বিতীয় বিবরণ : ২১ : ২৩) অনুযায়ী মসিহ্কে ক্রুশে বধ করে মিথ্যাবাদী ও লান্ছিত প্রমাণিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা তা করতে পারে নাই। নিম্নলিখিত তথ্য প্রমাণ করে যে মসিহ্ ক্রুশে মরেন নাই :—

(১) পিলাত একটি চিঠি রোমান রাজা সিজার তাইবেরিয়াস (Caes r Tiberius)-কে লিখেছিলো যে, মসিহ্ একজন নিরীহ এবং ধার্মিক লোক। [ভ্যাটিক্যান লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত]

২) পিলাতের স্ত্রী মসিহের নিরপরাধ হওয়ার সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখে ভীত হয়ে পিলাতের নিকট একটা চিঠি স্বয়ং আদালতেই পাঠিয়ে ছিলেন। (মথি ২৭ : ১৯)।

৩) পিলাত নিজেও নিরপরাধ মসিহ্কে বাঁচাবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল। (মথি : ২৭ : ১৭)।

৪) পিলাত মসিহের বিচার উদ্দেশ্যমূলকভাবে শুক্রবারে করেছিল এবং তার রায়কে কার্যকর করার জন্য সে উদ্দেশ্যমুলক ভাবে সেই দিনই আদেশ জারী করেছিল, কেননা সে জানত যে পরদিন পবিত্র সাবাত, এবং মসিহকে শুক্রবারে সূর্য অস্ত যাবার আগেই ক্রুশ থেকে নামিয়ে নিতে হবে। এমতাবস্থায় মসিহ মাত্র তিন চার ঘণ্টা ক্রুশে থাকার পর কিছুতেই মরতে পারেন না।

৫) মসিহকে ক্রুশে দেওয়ার আগে এবং পরেও সিরকা এবং মদ জাতীয় দ্রব্য পান করতে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তিনি বেহুশ থাকেন এবং তাঁর কষ্ট কম হতে পারে। (মথি ২৭ : ৪৮)। উল্লেখ্য যে ক্রুশের কাছে মদ ও সিরকা পূর্ণ একটি পাত্র যীশুর জন্য রাখা হয়েছিল (যোহন ১৯ : ২৯)।

৬ একটি ভয়ংকর ভুমিকম্প ও প্রচণ্ড তুফান এসে ছিল (মথি ২৭ ঃ ৪৫ ও ৫১) এবং এটা স্বাভাবিক যে কেহ ভুমিকম্পের সময় সেখানে উপস্থিত থাকতে পারে না। সেই সময় ও সুযোগে মসিহ্‌কে ক্রুশ থেকে নামিয়ে নেওয়া হয়েছিল, যার জন্য যোসেফ অরিমথিয়া পিলাতের কাছে অনুমতি নিয়েছিলেন। (মথি ২৭ ঃ ৫৭ ও ৫৮)।

৭) মসিহ প্রকৃতপক্ষে ক্রুশে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু অন্ধকারে লোকেরা মনে করল তিনি মরে গেছেন। অথচ কেউ তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করে দেখে নাই যে তিনি সত্যি মারা গেছেন কিনা।

৯) মসিহ একজন পুর্ণ জোয়ান এবং শক্ত-সামর্থ লোক ছিলেন। মাত্র তিন চার ঘন্টা ক্রুশে ঝুলে থেকে তিনি মরতে পারেন না। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ক্রুশ বিদ্ধ লোক তিন দিন যাবৎ জীবিত থাকতে পারত। আজ যদি কোন যুবককে শুধু পেরেক ঢুকিয়ে ক্রুশে ঝুলানো হয় এবং যে সব সুবিধা মসিহকে দেওয়া হয়েছিল তা যদি দেওয়া হয় তবে একদিনে সে কখনো মরতে পারে না।

১০) মসিহকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে নেওয়ার কিছু আগে তাঁকে একজন সৈনিক কুক্ষীদেশে বর্শা দ্বারা আঘাত করেছিল এবং সংগে সংগে মসিহর দেহ থেকে তরল রক্ত নির্গত হয়েছিল, (যোহন ১৯ ঃ ৩৪)। যা মৃত দেহ থেকে বের হওয়া কখনো সম্ভব নহে।

১১) মসিহ নিজে এই ক্রুশের লান্‌ছিত মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য ঈশ্বরের নিকট কাতর হয়ে দোয়া করেছিলেন (মথি ২৬ ঃ ৩৯) এবং বাইবেল বলে তাঁর সেই দোওয়া ঈশ্বর গ্রহণ করেছিলেন (হিব্রু ৫ ঃ ৭)

১২) ক্রুশে যীশুর হাড় ভাঙ্গা হয় নাই অথচ দু'জন ডাকাতকে তাঁর সাথে একই সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ করার পর না মরাতে তাদের পায়ের হাড় ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিল (যোহন ১৯ ঃ ৩১-৩৩)।

১৩) প্রধান যাজক কবরের দারোয়ানদেরকে ঘুষ দিয়েছিলেন যাতে তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যে যীশুর শিষ্যরা যীশুর লাশকে রাতের অন্ধকারে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। (মথি ২৮ ঃ ১২-১৫) কিন্তু আসল ব্যাপার তারা জানতো যে যীশু ক্রুশে মারা যান নাই।

কোন নবী কখনো নিজে কোন নিদর্শন দেখাতে পারেন না, তাঁরা আল্লাহতালার আদেশে দেখান (সুরা রাআদ ঃ ৩৯) মসিহও আল্লাহতায়ালার আদেশেই দেখাতেন (যোহন ৫ ঃ ৩০)। ফরিসিরা যখন মসিহকে তাঁর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ কোন একটি মোজেযার দাবী করে, তখন উত্তরে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তাঁর বেলায় যোনা নবী (ইউনুস আঃ)-এর নিদর্শন দেখানো হবে। যোনা ভাববাদীর নিদর্শন এই ছিল যে, তিনি এক বৃহৎ মৎসের গর্ভে জীবিত প্রবেশ করে, তিন দিবা-রাত্রি গর্ভে থেকে জীবিত বের হয়ে আসার পর তাঁর নির্দিষ্ট কার্য সমাধা করার জন্য নিজ কওমের কাছে নাইনভী গিয়েছিলেন (যোনা ১ ঃ ১৭, ২ ঃ ১০ ও ৩ ঃ ২)। মসীহর এই ভবিষ্যদ্বাণীটি তাঁর ক্ষেত্রে কেবল তখনই পুর্ণতা লাভ করেছিল বলে প্রমাণীত হবে

যখন তিনিও কবরে জীবিত প্রবেশ করেন এবং সেখানে তিন দিব-রাত্রি জীবিত থাকার পরে জীবিত বের হয়ে আসেন এবং তারপর তিনি তাঁর নির্দিষ্ট কাজ – বণি ইস্রাইল কুলের হারান মেষদেরকে খুঁজে একত্র করার কাজ সম্পাদন করেন। মসিহ (আঃ)-এর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাঁর কার্য উদ্দেশ্য যা তিনি বার বার ব্যক্ত করেছেন, সে কোথায় এবং কি ভাবে পুর্ণতা লাভ করেছিলো বাইবেলে কোথায়ও তার উল্লেখ নাই। বরং এর বিপরীত দেখা যায়। বাইবেল লেখকরা বলেন তিনি ক্রুশে মারা যাবার পরে মৃত অবস্থায় কবরে প্রবেশ করেছিলেন এবং সেখানে তিনি তিন দিব-রাত্রি নয় -মাত্র একদিন দুই রাত্র 'মৃত থাকার পরে পুনরুত্থিত হন এবং কবর থেকে উধাও হয়ে যান' (লুক ২৪ঃ ১-৩)। একথা কিন্তু বাইবেলে বর্ণিত মসিহর ক্রুশের পরবর্তি ঘটনাবলী এবং তাঁর বাক্যাবলীর বিরোধাত্মক। ক্রুশের ঘটনার পরে মসিহ কিছু সুস্থ হয়ে গেলীলের দিকে যান। পথে যখন শীষ্যদেরকে দেখা দিয়ে ছিলেন, তখন তাঁরা ভীত হয়ে বলেছিল, "আত্মা দেখিতেছি"। মসিহ তাদেরকে উত্তরে বলেছিলেন "কেন উদ্বিগ্ন হচ্ছ, আমার হাত এবং আমার পা দেখ। এই আমি স্বয়ং। আমাকে স্পর্শ কর, আর দেখ, কারণ আত্মার এরূপ অস্থি-মাংস নাই।" (লুক ২৪ঃ ৩৬-৩৯) অর্থাৎ তিনি আত্মা নহেন, তিনি অস্থি-মাংসের গড়া একজন জীবিত মানুষ। অপর দিকে বাইবেলই শিক্ষা দেয়ঃ "কিন্তু কেহ বলিবে মৃতেরা কি প্রকারে উত্থাপিত হয়, কি প্রকারে দেহ বা আসে? হে নির্বোধ! আপনি যা বপন করেন, তা না মরিলে জীবিত করা যায় না। মৃতদের পুনরুত্থান তদ্রূপ। ক্ষয় বপন করা যায়, অক্ষয় উত্থাপন করা হয়.....প্রাণীক দেহ বপন করা যায়, আত্মিক দেহ উত্থাপন করা হয়।" (১ করিন্থিয় ১৫ঃ ৩৫-৩৬ এবং ৪২-৪৪)

বাইবেলের উল্লেখ্য বাক্যগুলি যথাঃ "প্রাণীর দেহ বপন করা যায়, আত্মিক দেহ উত্থাপন করা হয়" এবং অপর দিকে মসিহ-এর বাক্য "আমার হাত ও আমার পা দেখ, এ আমি স্বয়ং, আমাকে স্পর্শ কর, আর দেখ, আত্মার এরূপ অস্থি-মাংস নাই।" এই দুইটি বাক্যকে একত্র করে অনুধাবন করলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তিনি ক্রুশে মরেন নাই— সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ক্রুশ থেকে তাঁকে জীবিত নামিয়ে আনা হয়েছিলো এবং তাঁর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনি কবরে জীবিত প্রবেশ করে চিকিৎসাধীন থাকেন। কিছু সুস্থ হওয়ার পরে তিনি বেরিয়ে আসেন এবং অন্ধকারে মরিয়ম মগদালীনী ও অন্য দু'জনকে দেখা দিলেন (যোহন ২০ঃ ১ ও ১১-১৬)। তৎপর মসিহ গালীলে গেলেন যেখানে শীষ্যদেরকে তিনি একত্র হওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন (মথি ২৮ঃ ১০)।

অতএব, বাইবেলের উল্লেখ্য বাক্যগুলি সুস্পষ্ট প্রমাণ করে যে, মসিহ তার ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী ক্রুশে মরেন নাই। তিনি ক্রুশ থেকে জীবিত নেমে আসেন, জীবিত কবরে প্রবেশ করেন এবং কবর থেকেও জীবিতই বের হয়ে এসেছিলেন।

ক্রুশের পরে :

ক্রুশের মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়ার পর হযরত মসিহ নাসেরী (আঃ) গালীলে যান, কিন্তু গালীল থেকে তিনি বাইবেলের ভিত্তিহীন বর্ণনা অনুযায়ী আকাশে যান নাই—কেউ তাঁকে আকাশে যেতে দেখেনও নাই। এবং এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কোন লুকাবার ব্যাপারও ছিল না। বাইবেল বলে মৃতদের পুনরুত্থান জালালী রূপের হয়ে থাকে (১ করিন্থিয় ৪২-৪৪) তাই যদি হয় তাহলে গালীলে যাওয়ার পথে তাঁকে আহার করার এবং ছদ্মবেশী সেজে ইহুদীদের থেকে লুকাবার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি ত সকলের সামনে বুক ফুলিয়ে আকাশে চলে যেতে পারতেন আর তাঁর শত্রুরা অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকত। আসল কথা হলো মসিহের জীবিত আকাশে উর্ধে যাওয়া একটি ভিত্তিহীন ব্যাপার এবং বানানো গল্প, যা পরে আবিস্কার করা হয়েছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মিশরে আলেকজেণ্ডেরীয়ার প্রাচীন খনন কার্য থেকে সেখানকার গ্রীক গীর্জায় একটি পত্র পাওয়া গিয়েছে যা ক্রুশের ঘটনার কিছুদিন পরে লিখা হয়েছিল। এই পত্রটি এসীন্স ভ্রাতৃত্ব মণ্ডলীর (Essenes Brotherhood) একজন যাজক তাঁর ভ্রাতৃত্বমণ্ডলীর একজন সদস্যকে আলেকজান্দ্রিয়াতে পাঠিয়ে ছিলেন। এক দীর্ঘ লিপিক খানি ১৯০৭ সনে চিকাগোর আমেরিকান বুক কোম্পানী "The Crucifixsion By An Eyewitness" এই নামে প্রকাশ করে। এতে ক্রুশের ঘটনা স্বচক্ষে দেখার সম্পূর্ণ বিবরণটি পেশ করা হয়েছে, যে মসিহকে যোসফ অরিমিথা এবং হেকিম নিকোডিমাস অন্যান্য শীষ্যদের সাহায্যে ক্রুশ থেকে মৃত অবস্থায় নয় বরং সজ্ঞাহীন অবস্থায় জীবিত নামিয়ে ছিলেন, এবং তারপর এক বিরাট পাথরের গুহার কবরে তাঁকে নিয়ে যাবার পর তিন দিবা-রাত্রি চিকিৎসাধীন রেখে সুস্থ করে তুলেছিলেন। কিছু সুস্থ হয়ে উঠার পর ছদ্মবেশে তিনি যেরুযালেম থেকে হিজরত করে পূর্ব দিকে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর আকাশে উঠে যাওয়ার ব্যাপার সম্পর্কেও সেই চিঠিতে পরিস্কার লেখা আছে : "শিষ্যরা যখন নতজানু হয়ে বসেছিলো যীশু তাদের সামনে থেকে উঠে কুয়াশার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, কিন্তু শহরে এই গুজবটি ছড়িয়ে পড়লো যীশু মেঘের ভিতর দিয়ে আকাশে চলে গেছেন। এ খবর তারাই আবিস্কার করেছিলো যারা যীশুর বিদায় বেলা সেখানে উপস্থিত ছিল না"। (পৃঃ ১২৪)

আসল কথা এই যে মসিহর আকাশে জীবিত চলে যাওয়ার ব্যাপার মিথ্যা এবং পরে আবিষ্কার করা হয়েছে। এই ব্যাপারে সেন্ট মার্কের শেষ বারটি আয়াত যে মসিহর আকাশে জীবিত চলে যাওয়ার সম্পর্কে আছে সেটা ১৬১১ এডিসনের বাইবেলে সামিল রয়েছে বটে, কিন্তু তদন্তের পর ১৮৮১ সনের রিভাইজড এডিশনে এটাকে মূল বচন থেকে বের করে মার্জিনাল নোটে দেওয়া হয়েছে। Sir John William Bergon তাঁর কমেন্ট্রিতে বলেছেন : "প্রাচীন কাল থেকে সেন্ট মার্কের গসপিলের শেষ অধ্যায়ের অষ্টম পদের পরে "ΤΕΑΟS"—(সমাপ্তি) লেখার রেওয়াজ রয়েছে।" এর অর্থ এই যে, ঐ ১২টি শ্লোক পরে ঢুকান হয়েছে। মসীহ প্রকৃতপক্ষে আকাশে যান নাই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, ক্রুশের মৃত্যু থেকে উদ্ধার পেয়ে এবং শীষ্যদের থেকে বিদায় নিয়ে হযরত মসিহ কোথায় গেলেন? এর উত্তর মসিহ (আঃ) নিজেই দিয়ে গেছেন যার উল্লেখ বাইবেলে রয়েছে। তিনি বলেছিলেন:

"আমার আরো মেষ আছে, সে সকল এই খোয়াড়ের নয়। তাহাদিগকেও আমার আনিতে হইবে এবং তাহারা আমার রব শুনিবে। তাহাতে এক পাল ও এক পালক হইবে।"

(যোহন ১০ : ১৬)।

বাইবেল বলে যেরুযালেম ধ্বংস হওয়ার পরে বণি ইস্রাইলদের হারানো গোত্রেরা যারা বেঁচে যায় তাঁদেরকে Nebuchednezzar ব্যাবিলনে বন্দী এবং বিতাড়িত করে আনে এবং তারা তার ও তার বংশধরের দাসত্ব করে (২-বংশাবলী ৩৬ : ২০)। তারপর সাইরেস (Cyrus) রাজা ব্যাবিলন দখল করে এবং ইহুদীদেরকে যেরুযালেমে ফিরে গিয়ে তাদের ধ্বংসাকৃত উপাসনালয়কে পুণরায় নির্মাণ করার অনুমতি দেয় কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া কেহই ফিলিস্তিনে ফিরে যায় নাই। (ইজরা ১ : ১-৪)। পরে পারস্য দেশের দারিয়াস (Darius) রাজা যখন ব্যাবিলন দখল করে এবং তাঁর রাজ্য ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তার করে তখন বণি-ইস্রাইলদের সেই গোত্ররা পারস্য, তিব্বত, আফগানিস্তান, কাশ্মীর ও মধ্যবর্তী ভারতে চলে আসে এবং সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করে। Apocrypha থেকে জানা যায় যে, তারা কখনো তাদের দেশে প্রত্যাবর্তন করে নাই (2-Esdres 13 : 29-36)। ঐতিহাসিকরা বড়ই দৃঢ়তা এবং যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, ইরান, আফগানিস্তান, বুখরা, খোরাসান কোহ্কান্দ, সমরখন্দ এবং ভারত, পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চল এবং কাশ্মীরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে সকল জাতি বসবাস করে তারা ইহুদী বংশোদ্ভূত লোক এবং আজও 'এদের নাম, গ্রামের নাম, গোত্রের নাম বাইবেল লিখিত বনি ইস্রাইলদের নামগুলির সাথে হুবহু মিলে' (Bernier's Travels P-430) সুতরাং এ কথা বিশ্বাস করতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে হযরত মসিহ তাঁর হারানো মেষের খোঁজে যেরুযালেম, নাসিব্যায়েন, সিরিয়, ইরান, আফগানিস্তান এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে কাশ্মীরে এসে বসবাস করেছিলেন। কোরআন শরীফে আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন যে, 'আমি মসীহ্ ইবনে মরিয়ম এবং তাঁর মাতাকে ঝর্ণা এবং উঁচু পাহাড়ি এলাকায় আশ্রয় দিয়েছিলাম।' (সুরা মোমেনুন-৫১)

সুতরাং হযরত মসিহ্ নাসেরী (আঃ) ক্রুশের মৃত্যু থেকে উদ্ধার হওয়ার পরে তাঁর হারানো মেষগুলিকে খুঁজে পেয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে দীর্ঘকাল বসবাস করেছিলেন এবং নবী করিম (সাঃ)-এর এক হাদিস অনুযায়ী ১২০ বৎসর জীবিত থাকার পর ইন্তেকাল করেন। কাশ্মীরে শ্রীনগর শহরের মহল্লা খানইয়ার ষ্ট্রিটে তিনি সমাহিত রয়েছেন। 'ইয়াজ আসীফ' নামের এক শাহজাদা নবীর এই সমাধিটি একদিকে প্রত্নতত্ত্ববিদদের জন্য একটি আকর্ষণ, এবং অন্য দিকে ধর্মের ইতিহাসে একটা নুতন অধ্যায়ের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতা

—মোহ্তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

বিশ্ব-নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর দাস হিসাবে শেষ যুগে মহা সংস্কারক রূপে ইসলামের পুণঃ প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা কল্পে আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক যে মহাপুরুষের আবির্ভব নির্দ্দিষ্ট ছিল তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)। তাঁহার নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) কাদীয়ানী।

তিনি বিশ্ব-নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতিনিধিত্বের বলে সকল নবী ও জাতির শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ। সকল নবী ও বুজুর্গান তাঁহার আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছিলেন। তাই বিশ্বের সকল জাতি এই যুগে তাঁহার আগমনে প্রতীক্ষারত ছিল। কিন্তু সকল নবীর বেলায় যেমন তাঁহাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা তাঁহাদিগকে মানে নাই এবং বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল তেমনি এই মহাপুরুষের বেলায়ও বিরুদ্ধাচরণ নির্দ্দিষ্ট ছিল। সকল লক্ষণের প্রকাশ এবং প্রমাণাদি ও নিদর্শনাবলীসহ তাঁহার আবির্ভাব হইলেও জাতি সমূহ তাঁহার শত্রু বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে এবং আজও উহা জারী আছে। কিন্তু ইহাতে ক্ষতি না হইয়া তাঁহার কাজের ব্যপ্তি দিনে দিনে পৃথিবীর সর্বত্র প্রকাশ লাভ করিতেছে এবং তাঁহার বিজয় দিনে দিনে উজ্জল হইতে উজ্জলতর হইয়া উঠিতেছে।

যেহেতু হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) সকল জাতির জন্য আসিয়াছেন, সেই জন্য প্রত্যেক জাতির ধর্মশাস্ত্রে তাঁহার আগমন এবং তাঁহার বিজয় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট আকারে ভবিষ্যদ্বানী রহিয়াছে।

কালের সাক্ষ্য অকাট্য হইয়া থাকে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত—তিনকাল প্রত্যেক নবীর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়া থাকে। অতীত নবী পরবর্তী নবীর আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বানী করিয়া যান। সমাগত নবীর যুগ তদনুযায়ী লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে এবং তাঁহার নিজের কতক ভবিষ্যদ্বানীও সংঘটিত হইয়া তাঁহার সত্যতার প্রমাণ যোগায় এবং বাকী ভবিষ্যদ্বানী সমূহ তাঁহার পরবর্তীকালে তাঁহার বিজয় ও বিরুদ্ধবাদীগণের পরাজয়ের আকারে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার সত্যতার উপর মোহরাঙ্কিত করিয়া যায়।

যুগ তাহার লক্ষণাবলীর পূর্ণতা সহ আজ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতার বড় সাক্ষী। ইসলাম ধর্মানুযায়ী চতুর্দশ শতাব্দী হিজরীর প্রথম দিকে তাঁহার আবির্ভূত হওয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং অপরাপর ধর্মশাস্ত্রের গণনায়ও একই সময়ে তাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বানী ছিল। তদনুযায়ী তিনি ১৩০৬ হিজরীতে তাঁহার দাবী ঘোষণা করেন এবং তাঁহার উপর ন্যাস্ত কার্য সম্পাদনের জন্য এক পবিত্র জামাত গঠন করেন ও সংস্কারকার্য আরম্ভ করিয়া দেন। সেই জামাত আজ সারা বিশ্বে স্থানে স্থানে ক্রমঃবর্ধমান হারে মিশন, মসজিদ, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া চলিয়াছে ও ধর্ম পিপাসুগণকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় দান করিয়া যাইতেছে।

একদিকে সময় যেমন হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতার সাক্ষ্য দিতেছে, তেমনি আসমান যমীন ও মানবজাতির অবস্থা সকলই তাঁহার সত্যতার সাক্ষ্য দিতেছে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন—

اسمعوا صوت السماء جاء المسیح جاء المسیح
نیز بشنو از زمین آمد امام کامگار
آسمان بارد نشان الوقت میگوید زمین
این دو شاهد از پئے من نعرہ زن چون بیقرار

"ঐ শোন স্বর উঠিয়াছে, "মসীহ আসিয়াছে, মসীহ আসিয়াছে" আরও শোন পৃথিবী কহিতেছে, ভাগ্যবান ইমাম আসিয়াছে, আকাশ নিদর্শন বর্ষণ করিতেছে এবং পৃথিবী কহিতেছে, সময় হইয়াছে। এই দুই সাক্ষী আমার সমর্থনে অধীর রবে মুখর।"

(হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর হাদীস অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ একই রমযান মাসে বিশেষ তারিখদ্বয়ে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ হওয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। সৃষ্টির আদিকাল হইতে এইরূপ গ্রহণ কখনও হয় নাই। তদনুযায়ী ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই রমযান তারিখের প্রথমভাগে অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলায় এবং ২৮শে রমযান তারিখে সূর্যগ্রহণ হয়। একই চান্দ্রমাসে দুই গ্রহণ হইলে, সদা সময়ের ব্যবধান থাকে ১৪ দিন কিন্তু এই গ্রহণদ্বয়ের ব্যবধান ছিল ১৫ দিন, যাহা সৃষ্টি কাল হইতে কখনও হয় নাই। পূর্ব গোলার্ধে একই রমযানে এই দুই গ্রহণ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয় এবং পশ্চিম গোলার্ধে একই রমযানে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। এইভাবে উভয় গোলার্ধের সকল মানুষের নিকট চন্দ্র ও সূর্য প্রেরিত পুরুষের আগমণের সাক্ষ্য দেয়।) এই গ্রহণ লাগিবার কয়েক বৎসর পূর্বেই হযরত মসীহ মওউদ (আঃ উহা সংঘটিত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া দাবী করিয়াছিলেন যে, এই দুই লক্ষণ প্রকাশিত না হইলে তাঁহার প্রেরিত পুরুষ হওয়ার দাবী মিথ্যা।) হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য সাব্যস্ত করিতে আকাশের দুই বড় জ্যোতির্ময় গোলকের নীরব জ্বলন্ত সাক্ষ্য কি বিস্ময়কর ও ঈমান-উদ্দীপক নহে? বাইবেল এবং হিন্দুশাস্ত্রেও চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের সাক্ষ্যের কথা উল্লেখ আছে। সুতরাং আকাশের দুই মহা লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত প্রেরিত পুরুষকে অস্বীকার করার পথ কোন জাতির নাই।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ -এর মোকাবেলায় আমেরিকায় আলেকজাণ্ডার ডুই, ইংলণ্ডের পিগট, হিন্দুস্থানে আবদুল হাকিম, লেখরাম প্রমুখ ব্যক্তিগণ খাড়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী লাঞ্ছনা জনক মৃত্যু বরণ করিয়া তাঁহার সত্যতায় সীল মারিয়া গিয়াছে।

প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের সত্যতায় আরও বহুবিধ লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং আগমণ ঘোষণা করিতে আজও হইতেছে। মানুষের মধ্যে অধার্মিকতা, নাস্তিকতা, ব্যভিচার, অনাচার অবিচার, যুলুম, দুর্নীতি এবং তজ্জনিত অশান্তি, নৈরাশ্য এবং হাহাকার এবং অন্যদিকে পাপাচারের ফলে ঝড়, তুফান, প্লেগ, মহামারী, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, প্লাবন, দুর্ভিক্ষ, নানাবিধ নৈসর্গিক বিপৎপাত ইত্যাদি নিদর্শনাবলী উচ্চকণ্ঠে প্রতিশ্রুত মহা-পুরুষের আগমন ঘোষণা করিতেছে। আল্লহ্তায়ালা বলিয়াছেন : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

"আমরা সতর্ককারী রসুল প্রেরণ না করিয়া শাস্তি অবতীর্ণ করি না।" (সুরা বনি ইসরাইল ১৭ আয়াত)। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী যেমন বহুল পরিমাণে শাস্তির নিদর্শন এ যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে, তেমনি তৃতীয় মহাবিশ্বযুদ্ধ বর্তমান বিপথগামী সভ্যতা ও অধিকাংশ মানবকুল ও জাতিসমূহকে ধ্বংস করিবার জন্য আজ দ্বারদেশে আঘাত হানিতেছে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন, "হে ইউরোপ, তুমিও নিরাপদ নহ এবং হে এশিয়া, তুমিও নিরাপদ নহ। হে দ্বীপবাসীগণ, কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারিবে না। আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জনমানবশুন্য পাইতেছি। সেই একমেবাদ্বিতীয়ম খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন। এখন তিনি রুদ্র মুর্তিতে স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিবেন।

যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক, ঐ সময় দূর নহে, আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী

আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এদেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিবে, লুতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে।

খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর ; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে ; যে ব্যক্তি খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নহে, কীট ; তাঁহাকে যে ভয় করেনা, সে জীবিত নহে মৃত।" (হাকিকাতুল ওহী, ১৯০৬ ঈসাব্দ)

মানবজাতির কি শুভ বুদ্ধির উদয় হইবে এবং আল্লাহ্তা'লার প্রেরিত পুরুষের ডাকে সাড়া দিয়া তাহারা বিপদ হইতে বাঁচিয়া যাইবে? ভবিতব্য খণ্ডন হইবার নহে। মানুষ মানিবে না। সুতরাং মহা-ধ্বংস অনিবার্য্য।

মানবজাতির বিপথগামীতার মূল কারণ হইল ক্রুশ মতবাদ। ইহা মানবজাতির ঈমানকে খাইয়া ফেলিয়াছে। ক্রুশ মতবাদকে ধ্বংস করা ছিল হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর বড় কাজ। ইহা তৌহীদকে ধ্বংস করিয়াছে এবং তাকওয়ার মূল কাটিয়া দিয়াছে। মানুষের মধ্যে তাকওয়া প্রতিষ্ঠিত করা এবং তৌহীদকে কায়েম করা রসুলগণের চিরাচরিত কাজ। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) সারা বিশ্বে এক মুত্তাকী জামাত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং ক্রুশ মতবাদকে ধ্বংস করিয়া তৌহীদকে কায়েম করিয়াছেন। তিনি তাঁহার দ্বারা প্রণীত ৮৮ খানা পুস্তকে এবং মোবাহেসা, মোবাহেলা, শত শত পত্রালাপ ও মৌখিক আলোচনা এবং হাজার হাজার নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে ইহা সাধিত করিয়াছেন। তাঁহার জীবদ্দশায় পাদরী-কুল বিপর্যস্ত ও পরাজিত হইয়াছিল। তাহাদিগের প্রতি চূড়ান্ত হামলা গত ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে

৪ঠা জুন তারিখে ত্রিত্ববাদের কেন্দ্র লণ্ডনের কমনওয়েল্থ হলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে করা হইয়াছে। ঐদিনের মহতি সভায় বিশ্বের খ্রীষ্টান মণ্ডলীর প্রতিনিধিগণ আহুত হইয়া আসিয়াছিলেন। হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) উক্ত সভায় বলেন — হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) অকাট্য প্রমাণাবলী সহকারে জগতে সর্বপ্রথম ঐশী-ইলহাম মূলে কুরআন ও বাইবেল হইতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্রুশ হইতে জীবিত উদ্ধার পাওয়া, স্বাভাবিক মৃত্যুতে মরিয়া তাঁহার কাশ্মীরে সমাধিস্থ হওয়া, তিনি খোদাও ছিলেন না এবং খোদার পুত্রও ছিলেন না, বরং আল্লাহ্তায়ালার এক সম্মানিত রসুল ছিলেন ঘোষণা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি উক্ত সভায় ইহার বিপরীত প্রমাণ পেশ করিতে বিশ্বের চার্চগুলিকে চ্যালেঞ্জ দেন। উহার পর বৎসর পার হইয়া গেল। পাদরীকুল নীরব।

তাহাদিগের এই নীরবতায় খ্রীষ্টান জগতে এক মহা আলোড়ন শুরু হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সমালোচনা উঠিয়াছে, ক্রুশের ঝাণ্ডাধারীরা আজ অবনত-মস্তক। মানুষ এবং আল্লাহ্তালার দরবারে তাহারা অপরাধী। ক্রুশ ধ্বংস হইয়াছে। ইসলামের শিক্ষার মধ্যেই মানবজাতির সকল সমস্যার সমাধান রহিয়াছে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতা আজ আন্তর্জাতিক পর্য্যায়েও প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাকে গ্রহণ ও অনুসরণ করার মাধ্যমেই আজ জগতের উদ্ধার নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

আল্লাহ্তায়ালা প্রত্যেক স্তরের মানুষের হেদায়েতের জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) -এর আবির্ভাব কাল হইতে তাঁহার সত্যতার বিভিন্ন শ্রেণী ও পর্যায়ের নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। আস্তিক, নাস্তিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, অর্থনীতিবিদ, বাদশাহ-ফকির এবং ওলি-দরবেশ সকলের জন্য সত্যকে সহজ সরল এবং সন্দেহাতীতভাবে বুঝিয়া ও গ্রহণ করিয়া আল্লাহ্তায়ালাকে লাভ করিতে সহায়ক নিত্য নূতন অকাট্য নিদর্শনাবলী সর্বত্র প্রকাশিত হইয়া চলিয়াছে। ইহা এই জন্য যে, কেহ যেন এ কথা বলিতে না পারে, দলিল প্রমাণে আমি তাঁহাকে চিনিতে ও তাঁহার সত্যতা বুঝিতে পারি নাই। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সীমার মধ্যে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। তথাপি নমুনা স্বরূপ কয়েকটা জ্বলন্ত নিদর্শনের কথা আমি উল্লেখ করিয়াছি। প্রত্যেক মানবের কর্তব্য চক্ষু ও কর্ণ খুলিয়া তাহার সৃষ্টিকর্তা স্বীয় বার্তাবাহকের মাধ্যমে যে প্রিয় ডাক দিয়াছেন, উহাতে সাড়া দিয়া তাঁহার অনুগ্রহ ও কল্যাণ লাভের অধিকারী হওয়া।

দুনিয়াতে নবী একা অসহায় অবস্থায় আসেন। এক নির্দ্ধারিত সময় পর্যন্ত শয়তানী শক্তি জগত জোড়া শক্তি ও উপকরণ দিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার জামাতকে ধ্বংস করিতে আসে। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার প্রলয়ের হাত দিয়া সব ওলট পালট করিয়া দেন। নবীর জামাত জয়যুক্ত এবং অধর্ম বিলুপ্ত হয়। প্রলয়ের দিন নিকটবর্তী। পঞ্চদশ শতাব্দী ঐ অদূরে। অধর্মের বিনাস এবং সত্য ধর্মের প্রতীক ইসলামের প্রতিষ্ঠার বিজয়-নিশান উড়াইয়া বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। যাহারা প্রলয়ের পূর্বে আল্লাহ্তায়ালার প্রেরিত পুরুষকে গ্রহণ করিবেন তাঁহারা ধন্য। তাহারা বাঁচিয়া যাইবেন। আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার সকল বান্দাকে তৌফিক দিন যেন তাহারা প্রেরিত পুরুষকে গ্রহণ করিয়া আযাব হইতে বাঁচিয়া কল্যাণের অধিকারী হন। আমিন।

খতমে নবুওত

—মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ (সদর মুকব্বী)

সৃষ্টির সেরা মানুষ। কেননা একমাত্র মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইল আল্লাহ্‌-তায়ালার এবাদত পালন পূর্বক তাঁহার আব্দ্‌ হওয়া তথা তাঁহার আনুগত্যের দর্পনে তাঁহার মা'রেফত বা সাক্ষাৎ তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার অনুগত, প্রেমিক ও প্রিয় এবং ঐশীগুণাবলীর আধারে পরিণত হওয়া। وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون অর্থাৎ 'আমি সকল শ্রেণীর মানুষকে আমার এবাদত পালন ও আব্দ্‌ হওয়ার হওয়ার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছি' —পবিত্র আয়াতে এবং كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت ادم অর্থাৎ 'আমি এক প্রচ্ছন্ন ভাণ্ডার স্বরূপ ছিলাম, অতঃপর আমি পরিচিত ও প্রকাশিত হওয়া পছন্দ করিলাম, সেজন্য আদমকে সৃষ্টি করিলাম'—পবিত্র হাদিসে মানব সৃষ্টির উক্ত উদ্দেশ্য ও উহার বাস্তবায়নের মূলতত্বটিই বর্ণিত হইয়াছে।

উক্ত পবিত্র ও মহান উদ্দেশ্য সফলের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে যথোপযুক্ত যাবতীয় শক্তি ও উপাদান দিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা অন্য কোন জীবকে তিনি দান করেন নাই এবং যুগে যুগে উক্ত উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নে সঠিক ও সরল পথের নির্দেশ দান করেন এবং উহার মূর্তীমান আদর্শ পেশ করেন মানবজাতির উৎকৃষ্টতম ব্যক্তিবর্গ তথা নবী-রসুলগণ, তারপর তাঁহাদের পবিত্র ও পূর্ণ অনুসারীবৃন্দ। আর সকল নবী-রসুলের মধ্যে অনন্যসাধারণ অদ্বিতীয় মর্যাদার অধিকারী শ্রেষ্ঠতম রসুল হইলেন পূর্ণ-মানব হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম—তাঁহাতেই বিকাশ ঘটিয়াছে নবুওত বা রেসালতের পূর্ণতম জ্যোতি ও গুণরাজীর। মোকামে-মুহাম্মদীয়াতের এই সর্বোচ্চ ও অনন্য আসনে গৌরব সাধ্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে কাহারই নাই। জগতে তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম—ইসলাম হইল একমাত্র জীবন্ত ও চিরস্থায়ী ধর্ম এবং তাঁহার উপর অবতীর্ণ শরীয়ত বা জীবন বিধান মহা-গ্রন্থ আল-কুরআন হইল পূর্ণ ও পরিণত চির কল্যাণবর্ষী হেদায়েত এবং সর্বশেষ শরীয়ত। সেইজন্য তাঁহার অনুসারীবৃন্দ আখ্যাত হইলেন 'খাইরে উম্মত' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট জাতি বলিয়া তাৎপর্যবহ গৌরবময় নামে। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার পবিত্র কালামে এ ঘোষণাই করিয়াছেন : كنتم خير امة اخرجت للناس—অর্থাৎ, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট উম্মত যাহাদিগকে মানবজাতির কল্যাণার্থে সৃষ্টি করা হইয়াছে।'

শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসাবে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফলের ক্ষেত্রে এই উম্মতের কার্যতঃ শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত হওয়া ও কায়েম থাকাই আবশ্যকীয়। অন্যথায় ফাঁকা দাবী বই আর

কিছুই ইহার মূল্য থাকে না। সেই জন্য কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই উম্মতের যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ পবিত্র কুরআনের কামিল শিক্ষা অনুসারে চলিয়া শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণতম রসুল (সাঃ)-এর অনুবর্তিতায় ও তাঁহারই কল্যাণ প্রবাহে আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য লাভের পূর্ণ সুফলসমূহ অর্থাৎ সকল প্রকারের রুহানী নে'মতের অধিকারী হইতে থাকিবেন। শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণতম রসুল (সাঃ) এবং শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণ ধর্ম-বিধান কুরআন শরীফের অনুসারী হিসাবে শ্রেষ্ঠ উম্মতের পক্ষে ইহাই শোভনীয় এবং যুক্তিযুক্ত ছিল বলিয়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার নৈকট্য লাভের চারি শ্রেণীর সুফল বা নে'মতের ওয়াদা দান করিয়াছেন : যথা—(১) সালেহীন, অর্থাৎ সেই সকল লোক যাহারা সত্য ও সৎকর্মের পথে পরিচালিত হইয়া উহার উপর উপযুক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছেন। (২) শহীদ, অর্থাৎ সেই সকল আত্মনিবেদিত ব্যক্তি যাহারা সত্যের পথে নিজেদের জীবনকে বিলীন করিয়া দেন। (৩) সিদ্দীক, অর্থাৎ সেই সকল মনীষী, যাঁহারা সত্যের প্রতীক বা প্রতিমূর্তি হইয়া যান এবং তাঁহাদের আকায়েদ ও আমল এবং কথায় ও কাজে লেশ মাত্র ব্যবধান বা ভিন্নতা অবশিষ্ট থাকে না। (৪) নবী বা রসুল, অর্থাৎ যাঁহারা আল্লাহ্‌তায়ালার পূর্ণ ও পরিণত নৈকট্যে উন্নীত হইয়া খোদাতায়ালার পবিত্র বাণী (ওহী ও এলহাম) যোগে বহুল পরিমাণে গায়েব বা হেদায়েতের সূক্ষ্মতত্ব এবং অজ্ঞেয় বিষয়াবলীর সংবাদ দানে ভূষিত হইয়া জামানার চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী মানুষের সংস্কার ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে আদিষ্ট ও প্রেরিত হন।

নবী শব্দের আভিধানিক অর্থও ইহাই। যথা—

المخبر عن المستقبل بالهام من الله (المنجد)

—অর্থাৎ, 'আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এলহাম (ঐশীবাণী) যোগে ভবিষ্যত সংবাদ বক্তা।' ইসলামী পরিভাষা হিসাবেও নবী-রসুলের ব্যাখ্যায় আকায়েদ বা ধর্ম-বিশ্বাসের প্রসিদ্ধ ও সর্ব স্বীকৃত গ্রন্থ 'নিব্রাসে' লিখিত আছে ;

وكلهم كانوا مخبرين مبلغين عن الله تعالى لان هذا الخبار و التبليغ
معنى النبوة و الرسالة - النبى من يخبر و الرسول من يبلغ (ص٤٥٠-٤٥١)

অর্থাৎ, তাঁহারা (নবী-রসুল) সকলই আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে ভবিষ্যতের সংবাদদাতা এবং মানুষের মধ্যে প্রচারকারী ছিলেন। কেননা অনুরূপ সংবাদ দান এবং প্রচারই হইল নবুওত ও রেসালতের অর্থ।'

(নিব্রাস, পৃঃ ৪৫০-৪৫১)

কুরআন শরীফেও আল্লাহ্‌তায়ালা নবুওয়ত ও রেসালাতের হকিকত ও সংগা নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول

অর্থাৎ—'অজ্ঞেয় সম্বন্ধে জ্ঞাত একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালা এবং যাহাকে তিনি রসুলরূপে মনোনীত করেন একমাত্র সেই ব্যক্তির নিকটই তিনি তাঁহার গায়েব বা অজ্ঞেয় বা গোপন রহস্যসমূহ

বহুল পরিমাণে প্রকাশ করেন।" ('এযহার আলা'-এর অর্থ প্রাধান্য দান অর্থাৎ বহুল পরিমাণে প্রকাশ করা)। (সূরা জ্বীন

অতএব, পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় আল্লাহ্তায়ালার নিকট হইতে বহুল পরিমাণে গায়েব বা ভবিষ্যতের গোপন রহস্য ও সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার নাম হইল নবুওত এবং উহা মানুষের নিকট তাহাদের হেদায়েত ও সংস্কারার্থে পৌঁছাইবার বা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র মনোনীত ও প্রেরিত ব্যক্তিকে 'রসুল' বলা হয়। অন্য কথায়, আল্লাহ্র তরফ হইতে বহুল পরিমাণে গায়েব-প্রাপক মনোনীত ও প্রেরিত ব্যক্তিকে কুরআন শরীফে নবী ও রসুল বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। শরীয়ত-বাহী হওয়া নবুওত ও রেসালতের মৌলিক ও জরুরী উপাদান নয়; শরীয়ত-বিহীনও নবী-রসুল হইতে পারেন এবং মানব ইতিহাসে তাঁহাদের সংখ্যাই অধিক। সেইজন্য কুরআন শরীফে শরীয়ত-বাহী ও শরীয়ত-বিহীন উভয়ের জন্য নবী ও রসুল শব্দের প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনও পার্থক্য বা ভেদাভেদ করা হয় নাই। (যথা, সূরা মরিয়ম : ৪র্থ রুকু)। অবশ্য শরীয়ত-ধারী নবীর সেলসেলা বা উম্মতের মধ্যেই শরীয়ত-বিহীন নবীগণের আগমন হইয়া থাকে সংস্কার ও সেই শরীয়তের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্তায়ালা কুরআন করীমে বলেন :

و اتينا موسى الكتاب و قفينا من بعده بالرسل (بقرة ٨٨)

انا انزلنا التوراة فيها هدى و نور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا (سورة مائدة : ٤٥)

অর্থাৎ—আমারা মুসাকে কিতাব (তৌরাতের শরীয়ত) দান করিয়া ছিলাম এবং মুসার পরে তাঁহার অনুবর্তিতায় ক্রমাগত বহু রসুল প্রেরণ করিয়া ছিলাম।' (সূরা বাকারা : ১ ৮৮ আয়াত) 'আমরা (মুসার উপর) তৌরাত অবতীর্ণ করিয়া ছিলাম, উহাতে ছিল বনি ইস্রাইলের জন্য হেদায়ত ও নূর এবং সেই শরীয়তকেই স্বীকৃতিদান করিয়া; ইহারই নির্দেশ অনুযায়ী মুসার পরে আগমনকারী নবীগণ ইহুদীদের মধ্যে দ্বীনি বিষয়াবলীর ফায়সালা করিতেন।' (সূরা মায়েদা : ৪৫ আয়াত)

উপরে উল্লেখিত আয়াত সমূহের দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, নবুওতের একটি মূল কাঠামো বা সংগা রহিয়াছে এবং উহার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনী নীতি ও নির্দেশ হইল এই যে, "লা নুফাররেকু বাইনা আহাদিম মির রুসুলিহি"—অর্থাৎ, মুমেনগণ বলিবে যে, আমরা নবী রসুলগণের মধ্যে কোন প্রভেদ করিনা—রেসালত বা নবুওতের মূল সংগা অনুসারে তাঁহারা সকলে একই গণ্ডীভুক্ত—বিনা ব্যতিক্রমে সকলের উপরই ঈমান রাখিতে হইবে; কিন্তু "তিলকার রুসুলু ফাদ্দ্বালনা বা'যাহুম আলা বা'যিন"—"অর্থাৎ, তাহাদের মধ্যে কতককে আমরা কতকের উপর শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছি"—অনুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে, তাহাদের মধ্যে প্রকার-ভেদও আছে এবং কুরআন অনুযায়ী তাহা নিম্নরূপ :

(১) শরীয়ত-বাহী নবুওত, অর্থাৎ যে নবুওতের সহিত কোন নূতন শরীয়ত অবতীর্ণ হইয়া থাকে। যেমন, হযরত মুসা (আঃ) অথবা সৈয়দনা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুওত ছিল। এরূপ নবুওতকে কোন কোন সময় ইসলামী পরিভাষায় 'হকীকী নবুওত' নামেও অভিহিত করা হয়। এই নাম ইহাকে এজন্য দেওয়া হইয়াছে যে নবুওতের প্রতিটি সেলসেলা বা শৃংঙ্খলের সূচনা শরীয়ত-বাহী নবুওতের সূত্র ধরিয়াই হইয়া থাকে এবং অন্য প্রকারের নবুওত উহার পশ্চাতে আসিয়া থাকে। সুতরাং গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে প্রকৃত প্রস্তাবে শরীয়ত-বাহী নবুওতই 'হকীকী নবুওতের' নাম পাওয়ার উপযুক্ত।

(২) দ্বিতীয় প্রকার নবুওত হইল শরীয়ত-বিহীন নবুওত অর্থাৎ যে নবুওতের সহিত কোন নূতন শরীয়ত নাজেল হয় না যদিও উহা মুস্তাকিল বা স্বাধীন নবুওত হইয়া থাকে যাহা সরাসরিভাবে খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে দানকৃত হয় এবং উহাতে কোন পূর্ববর্তী নবীর অনুবর্তিতা ও কল্যাণ প্রবাহের অংশীদারীত্ব থাকে না। যেমন, হযরত দাউদ (আঃ), সোলেমান (আঃ), ইয়াহিয়া (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবুওত ছিল। তাঁহারা মুসায়ী শরীয়ত তৌরাতের অনুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ভারপ্রাপ্ত খাদিম হিসাবে ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের নবুওত প্রাপ্তির মধ্যে হযরত মুসা (আঃ)-এর অনুবর্তিতা ও ফয়েজ বা কল্যাণ প্রবাহের কোনও প্রভাব বা অংশ ছিল না বরং তাঁহারা সরাসরীভাবে স্বাধীন রূপে নবুওতের পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। ইসলামী পরিভাষায় ইহাকে 'মুস্তাকিল নবুওত' নামেও অভিহিত করা হয়, কেননা মুস্তাকিল বলিতে এরূপ জিনিস বুঝায় যাহা অন্য জিনিসের উপর নির্ভর ব্যতিরকেই স্বীয় সত্তায় কায়েম হয়।

(৩) উল্লিখিত দুই প্রকারের নবুওতের পর যেহেতু আমাদের প্রভু ও নেতা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনন্য-সাধারণ ব্যক্তি-সত্তায় নবুওতের যাবতীয় পরিণত কল্যাণ ও জ্যোতির পূর্ণতম সমাবেশ ঘটে এবং তিনি এলাহী নৈকট্যের উচ্চতম মার্গে উন্নীত হইয়াছেন যেখানে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কাহারো পক্ষে পৌছান সম্ভব নয়, এবং শরীয়তও তাঁহাকে পূর্ণ ও চিরকল্যাণবর্ষীরূপে দান করা হইয়াছে যাহার পর নূতন কোন শরীয়ত আসিতে বা উহার কোন প্রয়োজনও হইতে পারে না, সেইহেতু তাঁহার আগমনের পর পবিত্র কুরআনের অধীনে মানুষের হেদায়েত ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে শরীয়ত-বিহীন উম্মতী বা জিল্লি নবুওতের পুরস্কার লাভের দুয়ার খোলা রাখা হইয়াছে। এইরূপ নবুওতের সহিত কোন নূতন শরীয়ত আসে না অথবা বলবৎ শরীয়তের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ও হয় না। তেমনিভাবে কেহ এই প্রকারের নবুওত পূর্ণতম শরীয়তবাহী নবীর অনুবর্তীতা ও কল্যাণ-প্রবাহ ব্যতিরেকে স্বাধীন ও সরাসরিরূপে লাভ করিতে পারে না, বরং উহা একমাত্র আপন পূর্ণতম নবীর অনুবর্তিতায়, তাঁহারই ফয়েজ ও কল্যাণে, প্রতিবিম্ব স্বরূপ লাভ হইয়া থাকে। এবং যেহেতু জিল্ল, অর্থ প্রতিবিম্ব সেইহেতু এরূপ নবুয়ত আপন পূর্ববর্তী নবীর

নবুয়তেরই প্রতিচ্ছায়া ও অংশবিশেষ হইয়া থাকে ; স্বতন্ত্র কোন কিছু নয়। ইহা উম্মতী নবুয়ত বলিয়া অভিহিত যাহা একমাত্র আমাদের প্রিয় প্রভু ও নেতা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পরে প্রকাশ পাওয়া নির্ধারিত হইয়াছে। ইহা সুস্পষ্ট যে, প্রথমোক্ত দুই প্রকারের নবুওত অর্থাৎ শরীয়ত-বাহী এবং শরীয়ত-বীহিন স্বাধীন (মুস্তাকিল) নবুওত হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর পরে আর হইতে পারে না বরং উক্ত দুই প্রকারের নবুওতের পূর্ণ ও পরিণত রূপ হিসাবেই হযরত নবী আকরাম (সাঃ) আখেরী ও সর্বশেষ নবী। ইহাতে কাহারো দ্বিরুক্তি থাকিতে পারে না কেননা ইহা সর্বস্বীকৃত বিষয় যে, তাঁহার পরে কোন শরীয়ত-ধারী নবী আসিতে পারেন না এবং এমন কোন নবীও হইতে পারেন না যিনি তাঁহার (সাঃ) অনুবর্তিতা ও কল্যাণ প্রবাহের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে নবুওত লাভে সক্ষম হন। এইরূপে একমাত্র তিনিই (সাঃ) আখেরী নবী। আর তৃতীয় প্রকার নবুওত অর্থাৎ উম্মতি ও যিল্লি নবুওতের ক্ষেত্রেও একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিবেন যে, ঐ ক্ষেত্রেও হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-ই আখেরী নবী হিসাবে থাকিয়া যান কেননা তাঁহার অনুবর্তিতায় তাঁহারই কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি প্রতিচ্ছায়া বিশেষ নবুওত লাভ করে সে তাঁহারই শাখা ও তাঁহারই অংশবিশেষ ; স্বতন্ত্র কোন কিছুই না। তাহার সত্তা শুধু একটা আইনা বা দর্পন বিশেষ, যাহাতে চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় সূর্যের আলো ও কিরণসমূহ প্রতিবিম্বিত হয় ; উহার অতিরিক্ত কোন কিছু নয়।

কুরআন শরীফে হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর অনুবর্তিতায় তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট উম্মত এই প্রকারের নবুওতসহ পূর্ববর্তীগণের সকল নে'মতের উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে বলিয়া সুস্পষ্ট ওয়াদা দান করা হইয়াছে। যেমন, আল্লাহ্তায়ালা বলেন :

و من يطع الله و الرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن اولئك رفيقا ٥
ذالك الفضل من الله و كفى بالله عليما ٥ (سورة نساء : ع ٩)

"যাহারা আল্লাহ্ এবং এই মহিমান্বিত রসুলের অনুবর্তিতা করিবে তাহারা সেই সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হইবে যাঁহারা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহ্গণ। উহারা পরস্পর উৎকৃষ্ট সঙ্গী। ইহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সেই নির্দিষ্ট কৃপা, এবং সর্বজ্ঞানী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।" (সুরা নেসা, ৯ম রুকু)।

এই আয়াতে স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাচ্চা অনুবর্তীগণের জন্য খোদাতায়ালার সকল প্রকার পুরস্কার লাভের দুয়ার খোলা রহিয়াছে। অর্থাৎ, তাঁহারা স্ব স্ব ক্ষমতা ও যোগ্যতানুসারে নবীও হইতে পারেন, সিদ্দীকও হইতে পারেন, শহীদও হইতে পারেন এবং সালেহও হইতে পারেন এবং ইহারা এরূপে সমমর্যাদা

সম্পন্ন যে, তাহাদের পারস্পরিক সঙ্গ তাহাদের একে অন্যের পক্ষে বড়ই কল্যাণময় ও উত্তম পরিচয় বহন করে। সুতরাং তাহারা পরস্পর উত্তম সঙ্গী তখনই হইতে পারেন যখন পূর্ববর্তী উম্মতের নবীগণের ন্যায় এই উম্মতের মধ্যেও নবী হইবেন, যেমন সিদ্দীক ও শহীদ এবং সালেহ্ও হইবেন। এই উম্মতে নবী না হইতে পারিলে উম্মতের কেহই সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহ্ও হইতে পারিবেন না। কিন্তু ইহা 'খাইরে-উম্মত' উপাধির পরিপন্থী এবং আলোচ্য আয়াতে ঘোষণাকৃত ওয়াদার বরখেলাফ। কেননা এই উম্মতের ব্যক্তিরা যদি শুধু স্থান, কাল ও পাত্রের দিক দিয়াই পূর্ববর্তী নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ্গণের শুধু ব্যহৃতঃ সঙ্গী হইবেন, নিজেরা এই সকল মর্যাদার অধিকারী হইবেন না, তাহা হইলে তাহারা 'পরস্পর উত্তম সাথী' বলিয়া কিরূপে সাব্যস্ত হইতে পারেন? উত্তম সাথী হওয়ার জন্য সমমর্যাদা ও সমগুণ সম্পন্ন হওয়া জরুরী। আরবী ভাষায় مع (সহিত) শব্দের অর্থ স্থান, কাল ও পাত্র ব্যতীত মর্যাদা ও গুণে একত্র হওয়াও বুঝায় (মুফরাদাত পৃঃ ৪৮৬) এবং 'মায়া' শব্দের আলোচ্য আয়াতে শেষোক্ত অর্থই প্রযোজ্য—বরং অপরিহার্য। যেমন, কুরআন শরীফে বহু স্থানে 'মায়া' শব্দ من (অন্তর্ভুক্ত) অর্থেই ব্যবহার হইয়াছে। যেমন, وتوفنا مع الابرار -অর্থাৎ, "পূণ্যবানগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া আমাদিগকে ওফাত দান কর।" এতদ্ব্যতীত আলোচ্য আয়াতে مع (মায়া) শব্দটি 'আন-নাবীয়ীন' শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আসে নাই বরং 'আনয়ামাল্লাহু আলাইহিম'-অর্থাৎ 'আল্লাহ্ হইতে পুরস্কার প্রাপ্তগণ'-বাক্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া আসিয়াছে, যাহাদের মধ্যে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ্ সকলই শামিল রহিয়াছেন। যদি 'মায়া' শব্দের কারণে এই আয়াতের অর্থ এই করা হয় যে, কোনও মুসলমান হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর শিষ্যত্ব ও অনুবর্তিতার ফলশ্রুতিতে নবুওতের পুরস্কার লাভ করিতে পারিবে না, শুধু বাহ্যিক ভাবে নবীগণের সঙ্গ লাভ করিবে, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, নাউযুবিল্লাহ্ কোন মুসলমান আদৌ পুরস্কার-প্রাপ্তগণের শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবে না এবং নবী তো দূরে থাকুক, এমন কি সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহ্ও হইতে পারিবে না। প্রত্যেক মুসলমান অতি সহজেই বুঝিতে পারেন যে এই প্রকারের কদর্থ স্পষ্টতঃ বাতিল।

বস্তুতঃ আমাদের শ্রেষ্ঠতম রসুল হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মর্যাদাসম্পন্ন উম্মতের জন্য তাঁহার অনুবর্তিতায় তাহাদের স্ব স্ব ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ্ হওয়ার পুরস্কারসমূহ ব্যতীত উম্মতি ও যিল্লি নবুওতের পুরস্কার পাওয়ার পথও খোলা রহিয়াছে। ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما —"ইহাই আল্লাহ্র পক্ষ হইতে নির্ধারিত বিশেষ কৃপা (যাহা এই মহিমান্বিত রসুল এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠ উম্মতের সমোচীত মর্যাদার কারণ), অসীম জ্ঞানের অধিকারী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।"

এতদ্ব্যতীত, 'উম্মুল-কিতাব' সূরা ফাতেহায় সকল প্রকারের এনয়াম বা পুরস্কার লাভের জন্য খোদাতায়ালা নিজে দোওয়া শিক্ষা দিয়াছেন যাহা প্রতিটি বা-আমল মুসলমান প্রত্যহ কমপক্ষে ৩০ বার করিয়া নামাজে পাঠ করিয়া থাকেন :

اهدنا الصراط المستقيم - صراط الذين انعمت عليهم - غير المغضوب عليهم ولا الضالين ٥

অর্থাৎ—"হে আল্লাহ্! তুমি আমাদিগকে রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতায়) সেই সরল পথে পরিচালিত কর যাহা তোমার পক্ষ হইতে পুরস্কার-প্রাপ্তগণের পথ ; তাহাদের পথে নয় যাহারা তোমার অভিশাপগ্রস্ত এবং তাহাদের পথেও নয় যাহারা পথভ্রষ্ট।"

উক্ত আয়াত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারীদের জন্য পূর্ববর্তীদের সকল প্রকারের পুরস্কার প্রাপ্তির কল্যাণময় আশ্বাস ও সুসংবাদের পাশাপাশি ঐ সকল পুরস্কার হইতে বঞ্চিত না হওয়ার ভয়াবহ সতর্কবাণীও বহন করিতেছে। কেননা কুরআন করীম এবং বহুল বর্ণিত হাদিস সমূহ অনুযায়ী 'মগযুব' এবং 'যাল্লীন' বলিতে ইহুদী এবং খ্রীষ্টানগণকেই বুঝায় যাহারা নবুওতসহ সকল প্রকারের রুহানী পুরস্কার হইতে বঞ্চিত হইয়া উক্ত দুই নামে অভিহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই অতুলনীয় দোওয়ার প্রথমাংশে এই মর্যাদাসম্পন্ন উম্মতের জন্য হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর প্রদর্শিত সেরাতে-মুস্তাকীমে পরিচালিত হইয়া ও কায়েম থাকিয়া নবুওত সহ সকল প্রকারের পুরস্কার লাভের পথকে সুগম ও প্রশস্ত করা হইয়াছে। দ্বিতীয়াংশে পুরস্কার বঞ্চিত না হওয়ার জন্য সতর্ক করা হইয়াছে।

দরূদ শরীফেও এই উম্মতের জন্য নবুওত সহ সকল শ্রেণীর পুরস্কার লাভের দোওয়া চাওয়া হয় : "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীম, ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।" অর্থাৎ—"হে আমার আল্লাহ্, মুহাম্মদ এবং তাঁহার অনুসারীদের উপর সেইভাবেই সকল কল্যাণ ও পুরস্কার বর্ষণ কর যেভাবে তুমি ইব্রাহীম ও তাহার বংশধরের উপর কল্যাণ ও পুরস্কার বর্ষণ করিয়াছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসাময় ও মর্যাদাবান।'

কুরআন শরীফে আল্লাহ্তায়ালা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধরের সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

وجعلنا في ذريتهما النبوة (আল-হাদীদ : ২৭)

অর্থাৎ—"আমরা নূহ এবং ইব্রাহীমের বংশধরের মধ্যে নবুওত দান করিয়াছিলাম।'

সুতরাং দরূদ শরীফের মধ্যেও এই উম্মতের জন্য নবুওতসহ সকল শ্রেণীর পুরস্কার দানের সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

আল্লাহ্তায়ালা হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর চরম ও পরম প্রশংসাস্থলে কুরআন শরীফের সূরা আহ্যাবের ৫ম রুকুতে বলিয়াছেন :

ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين

—"মোহাম্মদ (সাঃ) তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহেন, কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রসুল ও খাতামান নবীঈন।"

কুরআন শরীফে স্ব-বিরোধ নাই, থাকিতে পারে না বরং কুরআনের একাংশ অপরাংশের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। উপরুল্লিখিত কুরআনী আলোচনায় অকাট্যরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর সার্বিকগুণ ও কল্যাণবহ পূর্ণ ও পরিণত নবুওতের জ্যোতির্বিকাশে তাঁহার অনুবর্তিতায় তাঁহার সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁহার উম্মতের শ্রেষ্ঠ পদমর্যাদামূলে তাহাদের মধ্য হইতে অসংখ্য ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার সকল প্রকারের পুরস্কারের অধিকারী হইতে থাকিবেন এবং কেহ কেহ উম্মতি নবীও হইবেন। সুতরাং উক্ত আয়াতে 'খাতামান-নবীঈন' পদের যে অর্থ বর্তমানে সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত আছে তাহা পবিত্র কুরআন যেমন সমর্থন করে না, তেমনি হযরত নবী করীম (সাঃ)ও সেই অর্থ করেন নাই। অন্যথায় তিনি তাঁহার পর সমস্ত জগত পাপাচারে নিমজ্জিত হওয়ার এবং ইসলামের জন্য চরম বিপদ সংকুল আখেরী যুগে "ঈসা নবিউল্লা'র আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী (মুসলিম শরীফ দ্রষ্টব্য) করিয়া যাইতেন না এবং সেই আল্লাহর নবী ঈসা তাঁহার (সাঃ) উম্মত হইতেই হইবেন বলিয়া বলিয়া যাইতেন না (ওয়া ইমামুকুম মিনকুম—বুখারী ও মুসলিম)। তেমনিভাবে উম্মতি নবী হিসাবে তাঁহার আগমনকে হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) হইতে দেওবন্দ মাদ্রসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মোহাম্মদ কাশেম নানতবী (রহঃ) পর্যন্ত বহু শীর্ষস্থানীয় সর্বমান্য ইমাম ও বিশিষ্ট রব্বানী আলেমগণ স্পষ্টাক্ষরে বলিষ্ঠরূপে ইহা বলিয়া যাইতেন না যে উম্মতে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ আল্লাহ্‌র নবী হইবেন এবং তাঁহার উম্মতি নবী হিসাবে আগমন 'খাতামান নবীঈন' বা 'লা নবীয়া বা'দী'-কথার পরিপন্থী নয়। বরং উহাদের প্রকৃত অর্থ এই যে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর পরে এমন কোন নবী আসিতে পারেন না যিনি তাঁহার উম্মতের মধ্য হইতে নহেন বা এমন কোন নবীও হইতে পারেন না যিনি কোন নূতন শরীয়ত প্রবর্তন করেন অথবা কুরআন শরীফের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন করেন। (বিস্তারিত উদ্ধৃতিসমূহের জন্য খতমে নবুওত, ইসলামেই নবুওত পুস্তক সমূহ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং খতমে নবুওত-এর অর্থ তাহা নয় যাহা ভুলবশতঃ মনে করা হইয়াছে, যেমন আরও বহু প্রকারের ভুল সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। আহ্‌মদী মুসলমানগণ 'খাতমান নবীঈন' পদের সেই অর্থ করেন যাহা ইসলামের পূর্ববর্তী অসংখ্য মনীষীগণ করিয়া আসিয়াছেন ; আর যে অর্থ কুরআন শরীফ, রসুলের সুস্পষ্ট হাদিসসমূহ, আরবী ভাষার ব্যকরণ ও উহার বিধিবদ্ধ বাগধারা এবং এই পদের উহাতে প্রচলিত ব্যবহার সমর্থন করে। উক্ত আয়াতেও সেই প্রকৃত অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থ প্রযোজ্য হইতে পারে না। নিম্নে এই যুগে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) কর্তৃক পেশকৃত অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ সহ খতমে-নবুওতের প্রকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া গেল :

(অবশিষ্টাংশ ৭২-এর পৃঃ দেখুন)

ইসলাহের গুরুত্ব ও সঠিক পদ্ধতি

ওবায়দুর রহমান ভুঁইয়া, নাজেমে আলা,
মজলিসে আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ

"ইসলাহ" শব্দের অর্থ সংশোধন। সুতরাং সংশোধনের প্রয়োজন হইতে পারে যখন কোন জিনিস বিগড়াইয়া যায়। কোরআন শরীফে আছে যে,

ظهر الفساد فى البر و البحر (যাহারাল ফাসাদু ফিল বার্‌রি ওয়াল বাহ্‌রি)

—স্থল ও জল উভয়ই বিগড়াইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ যে সমস্ত জাতির মধ্যে কিতাব আসিয়াছে তাহারাও বিগড়াইয়া গিয়াছে এবং যাহাদের মধ্যে কিতাব আসে নাই তাহারাও বিগড়াইয়া গিয়াছে। যখন এমন সময় আসিবে যে সমস্ত লোক কোন ধর্ম মানে তাহারাও বিগড়াইয়া যাইবে এবং যাহারা কোন ধর্ম মানে না তাহারাও বিগড়াইয়া যাইবে তখনই ইসলাহের প্রয়োজন হইবে।

আমরা যখন বর্তমান মানুষের দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন দেখিতে পাই যে, মানুষের চরিত্রের অধঃপতন ঘটিয়াছে। যাহারা কিতাবধারী অর্থাৎ মুসলমান, ইহুদী, নাছারা, বৌদ্ধ, হিন্দু কেহই ধর্মের অনুশাসন মানিয়া চলিতেছে না। সবাই মনে করিতেছে যে, এই সমস্ত ধর্ম এবং ধর্মীয় অনুশাসন এই জামানাতে অচল। আমাদের যুগ বিজ্ঞানের যুগ। আমরা অনেক বুদ্ধিমান এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত। সুতরাং আমাদের কোন ধর্মের দরকার নাই। বর্তমান জামানার মানুষ এক নূতন 'থিউরী' কায়েম করিয়াছে। সে মনে করে যে তাহার সৃষ্টির কোন উদ্দেশ্য নাই। তাহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইতেছে নিছক ক্রীড়া বা তামাশা: 'Eat, drink and be merry'। এ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নাই। মৃত্যুর পরে তাহার কোন জীবন নাই। সুতরাং চুরি, ডাকাতি, জাল জুয়াচুরি করিয়া এই পৃথিবীর জীবনে তাহাকে সুখী হইতে হইবে। তাহাকে বেশী বেশী টাকা অর্জন করিতে হইবে। এই দৃষ্টি-ভঙ্গির ফলে মানুষের অধঃপতন হইতে হইতে মানুষ এখন অবনতির চরম স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাই আফাহ্‌তায়ালা মানব জাতিকে এই চরম দুর্দিনে রক্ষা করার জন্য তাহার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ মসীহে মাহ্‌দী হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) কাদিয়ানীকে পাঠাইয়াছেন তাহার মূল কাজ হইল এসলাহ করা। নবীগণ পৃথিবীতে আসিয়া কি করেন? প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা মানুষের ইসলাহ করেন।

يتلو عليهم ايته و يعلمهم الكتاب و الحكمة و يزكيهم

(ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহী ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা ওয়া ইউযাক্কিহিম)

তাঁহারা মানুষের কাছে আল্লাহ্তায়ালার আয়াত সমূহ পাঠ করিয়া শুনান, তাহাদিগকে কিতাব শিক্ষা দান করেন এবং কিতাবের হুকুম আহ্কামের গূঢ় রহস্য তাহাদিগকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝান এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করেন। এইভাবে তাঁহারা মানব জাতির সংশোধন করিয়া থাকেন।

মানুষের জন্য ত্রিবিধ সংশোধন প্রয়োজন হইয়া থাকে :

(১) তাহাদের মন ও মানসিকতার পরিবর্তন, (২) তাহাদের কার্য-কলাপের পরিবর্তন, এবং (৩) তাহাদের 'জজবাত' বা অনুভূতির ইসলাহ্।

প্রথমতঃ তাহাদের মন ও মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন। এ যুগের লোকের জীবন দর্শন 'Eat, drink and be merry' অর্থাৎ, খাও, পিয়ো এবং ফুর্তি কর। কিন্তু ইসলামের জীবন-দর্শন হইতেছে : و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون o

(ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন)

আল্লাহ্ বলেন যে, জ্বিন এবং মানুষকে আমি আমার এবাদত ছাড়া আর কোন কিছুর জন্য সৃষ্টি করি নাই। সুতরাং নবীর প্রথম কাজ মানুষের বিশ্বাসের পরিবর্তন করা, তাহাদের জীবন-দর্শনের পরিবর্তন করা এবং সেই অনুসারে জাতির মন ও মানসিকতার পরিবর্তন করা। তাহাদের যখন মস্তিষ্কের পরিবর্তন হইবে এবং চিন্তা-ধারার পরিবর্তন হইবে যে 'আমাদিগকে আল্লাহ্তায়ালার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে', তখন তাহারা আল্লাহ্ কি, তিনি কি চাহেন, কিভাবে তাঁহার ইবাদত করা যায়, সে দিকে চিন্তা করিবে। সুতরাং নবী যখন মানব সমাজের উদ্দেশ্য বা গন্তব্য-স্থল নির্ধারণ করিতে সক্ষম হইবেন তখন তাহাদের সেই গন্তব্যস্থলে কিভাবে পৌঁছা যায় তাহার দিকে মনোনিবেশ করিবেন। তাই দ্বিতীয় পর্যায়ে নবী তাঁহার জামাতের লোকদের আমলের ইসলাহের দিকে লক্ষ্য করেন।

আল্লাহ্কে লাভ করিতে হইলে তাঁহার ইবাদতকে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে যে সকল কাজ করিতে হয় তাহার মধ্যে রহিয়াছে : (১) নামায কায়েম করা, (২) রোযা রাখা, (৩) যাকাত প্রদান করা, এবং ৪) হজ্ব করা।

আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিক ছাড়াও ইবাদতের দুইটি অংশ রহিয়াছে : একটি শারিরীক এবং অপরটি আর্থিক। শারিরীক ইবাদত দ্বারা নিজের শরীরকে আল্লাহ্তায়ালার উদ্দেশ্য অনুসারে পরিচালিত করা যায় এবং আর্থিক ইবাদত দ্বারা সমাজ-দেহকে পবিত্র করা যায়। তাই আল্লাহ্তায়ালার সাথে মুমেন মেরাজে মিলিত হয় নামাযে। আবার সমাজের সবাইকে আল্লাহ্-প্রেমিক বানাইবার জন্য, তাহাদের মধ্যে তালীম-তরবিয়তের জন্য, তাহাদের খাদ্য-বস্ত্র ইত্যাদি সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের যাকাতের টাকা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইবে বায়তুল মাল। আর সেই বায়তুল মালের পরিচালক হইবেন আল্লাহ্তায়ালার নবী স্বয়ং এবং তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার খলিফা।

তাই নবীর তিরোধানের পরে তাঁহার কার্যকে সম্পূর্ণ করার জন্য খেলাফতের নেজাম প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) পৃথিবীতে মানুষের আমলেরও পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। শত শত ফেদায়ী (উৎসর্গ-চিত্ত) সাহাবী তৈরী করিয়াছেন যাঁহারা তাঁহার জীবদ্দশাতে নামায-রোযার মাধ্যমে খোদাকে দর্শন করিয়াছেন। আবার তাঁহার মৃত্যুর পরেও তাঁহার কাজকে সুন্দর ও সুচারুরূপে পরিচালনা করার জন্য তাঁহাদের টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, মান-সম্মান তুলিয়া দিয়াছেন তাঁহাদেরই মধ্যে নির্বাচিত খলীফা হাকিম নুরুদ্দিন (রাঃ)-এর হাতে। কোন আত্ম-গরীমা নাই। সবাই হযরত মৌলনা হাকিম নুরুদ্দিনকে তাহাদের নেতা হিসাবে বরণ করেন।

এখন আসে সংশোধনের তৃতীয় পর্যায় অর্থাৎ 'জজবাত' বা অনুভূতির সংশোধন। একজনের বিশ্বাসের সংশোধন হইতে পারে এবং তাহার আমলের সংশোধন হইতে পারে, কিন্তু যদি তাহার অনুভূতির সংশোধন না হয়, তবে সে নেতাকে বা খলীফাকে মানিতে রাজী হইবে না। তাহার অনুভূতি বলিতে পারেঃ "আমি শ্রেষ্ঠ, আমি নেতা হওয়ার উপযুক্ত"। যাহার ফলে মৌলানা মোহাম্মদ আলী, খাজা কামালউদ্দিন প্রমুখ ব্যক্তিগণ জামাত ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। সুতরাং সর্বশেষ স্তরে অনুভূতির সংশোধন করাও নবীর কাজ। মানুষ মনে করিবে যে – 'আমি অমুক হইতে শ্রেষ্ঠ'। (আনা খাইরুম মিনহু) انا خير منه

এই রোগ মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়া যায়। তাই হযরত মসীহ মাউদ (আঃ) বলিতেছেন :

"মনে রাখিও, অহংকার শয়তান হইতে আসিয়াছে এবং ইহা মানুষকে শয়তান বানাইয়া দেয়। যখন পর্যন্ত মানুষ ইহা হইতে দূরে যাইতে না পারে তখন পর্যন্ত সত্যকে সে গ্রহণ করিতে পারে না এবং ইহা আল্লাহতায়ালার আশীষ লাভের পথে বাধা স্বরূপ দাঁড়াইয়া যায়। কোন প্রকারেই অহংকার করা উচিত নয়—ধন-ঐশর্য্যের জন্যও নয়, জ্ঞানের জন্যও নয় এবং পদ-মর্য্যাদার জন্যও নয়, অথবা বংশ-মর্য্যাদার জন্যও নয়। এই সমস্ত কারণেই মানুষের মধ্যে অহংকারের সৃষ্টি হয়। যখন পর্য্যন্ত মানুষ নিজেকে এই সমস্ত ধ্যান-ধারণা ও অনুভূতি হইতে মুক্ত না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর নিকটে সম্মানিত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে না।" (মালফুজাত, জিলদ ৭, পৃঃ ২৭৬)

شوخی و کبر دیو لعین کا شعار ہے
آدم کی نسل وہ ہے جو خاکسار ہے
اے کرم خاک چھوڑ دے کبر و غرور کو
زیبا ہے کبر حضرت رب غیور کو
بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں

شاید اسی سے داخل ہو دار الوصال میں
چھوڑو غرور و کبر کہ تقوی اسی میں ہے
ہو جاؤ خاک مرضئ مولی اسی میں ہے
تقوی کی جڑ خدا کے لئے خاکساری ہے
عفت جو شرط دیں ہے وہ تقوی میں ساری ہے-

"আত্মগরীমা ও অহংকার এই দুইটি অভিশপ্ত দানবের আচরণ ; সেই প্রকৃত মানব সন্তান যাহার মধ্যে রহিয়াছে বিনয়। হে মাটির কীট ! আত্মভরীতা ও অহংকার পরিত্যাগ কর ; অহংকার করা শুধু তাঁহারই সাজে যিনি আত্ম মর্যাদায় মহীয়ান প্রভূ আল্লাহতায়ালা)। নিজের চিন্তায় নিজেকে সকলের চাইতে হীন জ্ঞান কর ; তাহা হইলেই মিলনের সৌধে প্রবেশ করিতে পারিবে। আত্মভরীতা ও অহংকার ছাড়িয়া দাও, কেননা ইহার মধ্যে তাকওয়া নিহিত আছে। তুমি ধূলায় মিশিয়া যাও, তাহাতেই আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি। তাক্‌ওয়ার মুল হইতেছে আল্লাহতায়ালার জন্য বিনয়াবনত হওয়া ; বিশ্বস্ততা যাহা ধর্মানুবর্তীতার পূর্বশর্ত. তাহা তাকওয়াতেই পরিপূর্ণ হয়।" (বারাহীনে আহমদীয়া, পঞ্চম খণ্ড)

হে বন্ধুগণ ! আসুন আমরা দোয়া করি, আল্লাহতায়ালা যেন আমাকে এবং আপনাদের সবাইকে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর শিক্ষ অনুসারে নিজেদের জেহনী (মস্তিষ্কের), আমলী (কর্মের) ও জজবাতী (অনুভূতির) এসলাহের তৌফিক দান করেন। আমীন।

পাইলট গ্যাস ষ্টোভ

গৃহিণীদের জন্য সুসংবাদ

আবার এসেছে আপনাদের সেবায় বাংলাদেশের একমাত্র সর্বাধুনিক ও দীর্ঘস্থায়ী গ্যাসের চুলা।

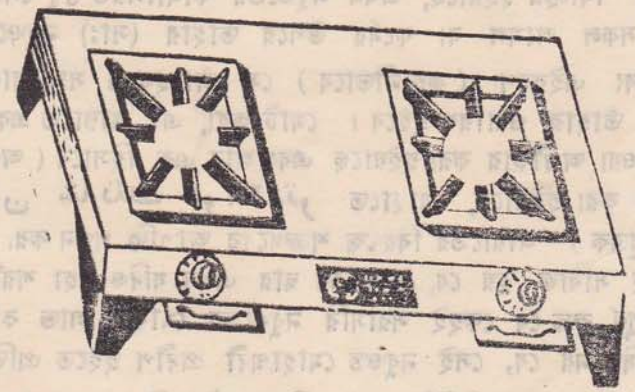

১৪৭/৩, ডি, আই, টি এক্সটেনসন রোড, ফকিরাপুল, (পানির ট্যাংকের বিপরিত)

ঢাকা।

(খতমে নবুওতের অবশিষ্টাংশ)

(৬৭ পৃষ্ঠার পর)

"আমাদের ঈমান এই যে, সর্বশেষ কিতাব ও সর্বশেষ শরীয়ত একমাত্র পবিত্র কুরআন, এবং উহার পর কিয়ামতকাল পর্যন্ত এই রূপে বা এই অর্থে কোন নবী নাই যিনি শরীয়ত-বাহী হন অথবা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয় সাল্লামের অনুবর্তিতা ব্যতরেকে সরাসরি ওহী বা ঐশীবাণী লাভ করিতে পারেন ...ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে, খোদাতায়ালা যেখানে এই ওয়াদা করিয়াছেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহেস ওয়া সাল্লাম "খাতামান আম্বিয়া" সেখানেই এই স্পষ্ট ইশারাও করিয়াছেন যে, এই মহামান্বিত রসুল (সাঃ) তাঁহার পূর্ণতম রুহানিয়াতের কারণে সেই সকল সাধু ও পুণ্যবান ব্যক্তির জন্যে পিতার মর্যাদা রাখেন, যাহাদের পূর্ণ আধ্যাত্মিক বিকাশ তাঁহার অনুবর্তিতার দ্বারা সাধিত হয় এবং ওহী-এলাহী এবং ঐশী কালামে তাহাদিগকে ভূষিত করা হয়। যেমন তিনি বলিয়াছেন :

ما كان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين

অর্থাৎ, "মোহাম্মাদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ আঃ) তোমাদের (সাবালক) পুরুষগণের মধ্যকার কাহারো পিতা নহেন, কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রসুল এবং খাতামান্নবীয়িন।"

ইহা সুস্পষ্ট যে, لكن (লাকিন—কিন্তু) শব্দ আরবী ভাষায় পূর্বে উল্লেখিত বিষয়ের কম্‌তি বা বিচ্যুতিকে দুর করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং উক্ত আয়াতের প্রথমাংশ যে বিচ্যুতিমূলক বা নেতিবাচক বিষয় সাব্যস্ত করা হইয়াছে অর্থাৎ আঁ-হযরত সাসাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তা হইতে যে বিষয়টির বিচ্যুতি ঘটান হইয়াছে ও অস্বীকার করা হইয়াছে, তাহা হইল দৈহিকরূপে তাঁহার কোন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের পিতা হওয়া। সুতরাং আঁ-হযরত (সাঃ আঃ)-কে খাতামান্নবীন' সাব্যস্ত করিয়া 'লাকিন' শব্দ দ্বারা সেই বিচ্যুতিমূলক বা নেতিবাচক বিষয়টির প্রতিকার বা অপনোদন করা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, তাঁহার পরে প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরি প্রাপ্ত যে নুওত সেই নবুওতের ফায়েয ও কল্যাণ সমূহের ধারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এখন নুওতের কামালিয়ত শুধু সেই ব্যক্তিই পাইতে পারে, যে নিজের সকল আমল বা কর্মের উপরে তাঁহার (সাঃ) নবুওতের অনুবর্তিতার মোহর রাখিবে, এবং এইরূপে (রুহানীভাবে) সে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পুত্র এবং তাঁহার ওয়ারিশ হইবে। মোট কথা, এই আয়াতে এক হিসাবে (অর্থাৎ দৈহিকরূপে) পিতা হওয়া অস্বীকার করা হইয়াছে এবং আর এক হিসাবে (অর্থাৎ রুহানীরূপে) পিতা হওয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে, যাহাতে ان شانئك هو الابتر (অর্থাৎ-নিশ্চয় তোমার শত্রুগণই অপুত্রক)—আয়াতের বিরুদ্ধে শত্রুগণের আপত্তি খণ্ডন করা যায়। আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই সাব্যস্ত হয় যে, নবুওতের দ্বার এখন যদিও উহা শরীয়তবিহীনই হইবে তথাপি এইরূপে সম্পূর্ণ রুদ্ধ যে কেহই সরাসরি নবুওতের মোকাম লাভ করিতে পারে, কিন্তু এইরূপে রুদ্ধ বা নিষিদ্ধ নয় যে, সেই নবুওত মোহাম্মদী প্রদীপ হইতে প্রতিবিম্বিত ও কল্যাণ মণ্ডিত হইবে।" (রিভিউ বর সুবাহিসা বাটালভী ও আহলে হাদিস, পৃঃ ৬-৭)

— —

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীর অষ্টম বার্ষিক ইজতেমার একটি দৃশ্য ॥

ইসলামের বর্তমান খেলাফত

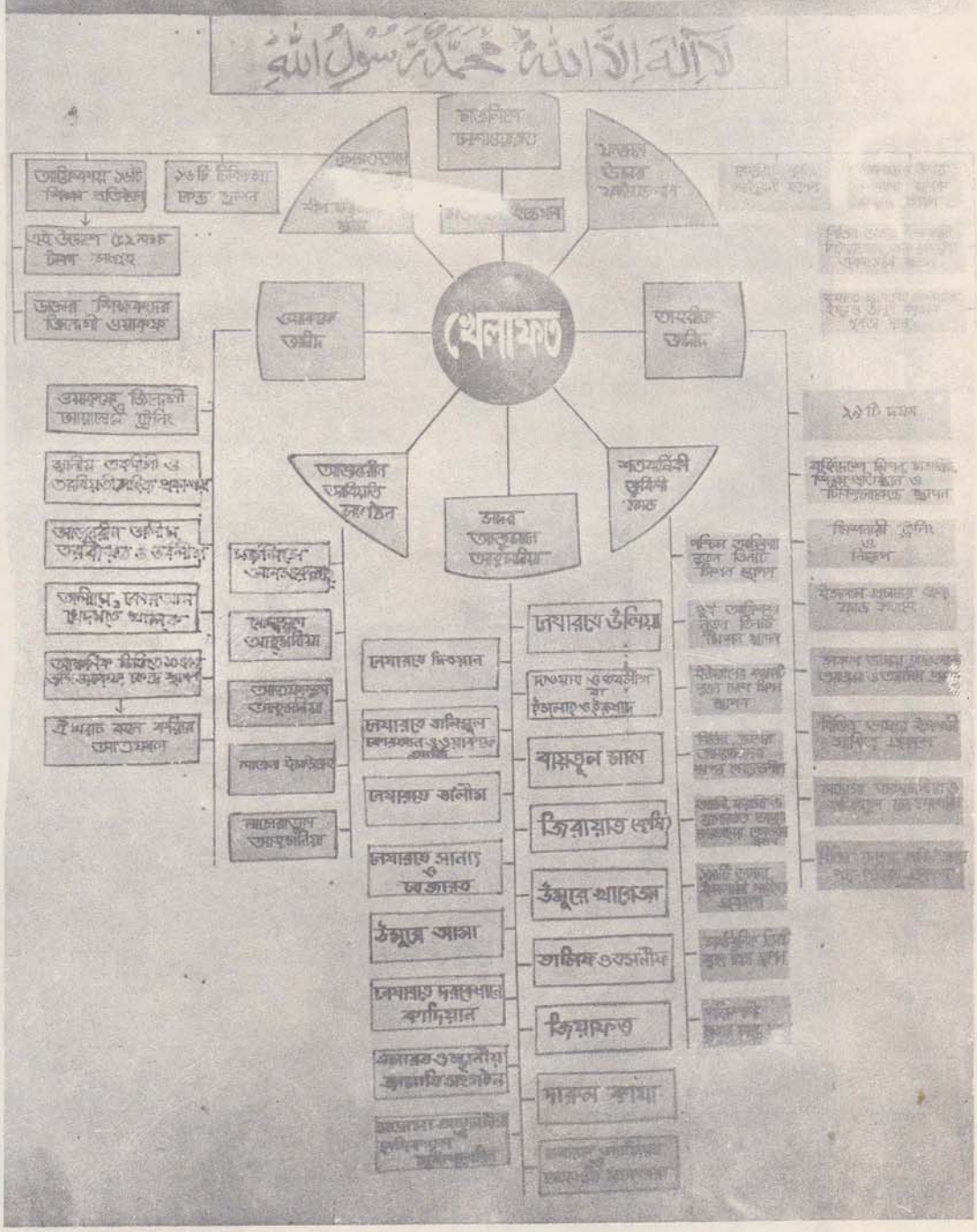

ইসলামের বর্তমান খেলাফত—বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামাতের সাংগনিক কাঠামো।

ইসলামে খেলাফতের গুরুত্ব

—মোহাম্মদ আমীর হোসেন

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। মানবদেহ বিভিন্ন বিবর্তনের মাধ্যমে আজ যেমন এক পূর্ণতাপ্রাপ্ত অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে, তদ্রূপ ধর্মীয় বিধান বা শরীয়তও হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে এসে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এখন থেকে কেয়ামত কাল পর্যন্ত বিশ্বমানবের জন্য এই পূর্ণতাপ্রাপ্ত ধর্ম ইসলামকেই আল্লাহতায়ালা মানুষের হেদায়েতের জন্য নির্ধারিত করেছেন।

কোন মানুষ ব্যক্তি হিসাবে পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে না। নবী-রসুলগণও মানুষ, তাই তাঁরাও মৃত্যুর অধীন। আল্লাহ্‌তা'লা যুগে যুগে নবী-রসুলগণের মাধ্যমে মানুষের জন্য হেদায়েত বা ধর্মীয় ব্যবস্থা প্রেরণ করেন যার অনুসরণের ফলে মানুষ ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করে এবং আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ ও ফজল দ্বারা ভূষিত হয়। নবীর মৃত্যুর পর তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাঁরা সত্যিকার ভাবে খোদার মনোনীত ধর্মের সঠিক হেফাজত করেন ও আপন নবীর উদ্দেশ্যাবলীর পূর্ণতা সাধন ও তাহার আধ্যাত্মিক জ্যোতি ও কল্যাণ এবং আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ ও আশিসকে মানুষের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবাহিত রাখেন, তাঁরাই হলেন নবীর খলীফা। সেই দিক থেকে বলা যায়, মানুষের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক অগ্রগতি ও জাতি সমূহের স্থায়িত্ব এবং মজবুতির জন্য যে খোদায়ী সংগঠন হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কার্যকরী রয়েছে তারি নাম খেলাফত।

খলীফা শব্দের অর্থ ও খলীফার শ্রেণীবিভাগ:

খলীফা শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত। কোরআন শরীফে প্রধানতঃ এই অর্থেই খলীফা শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ্‌তায়ালার বিধি-নিষেধ অমান্য করে যখন কোন জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তার স্থলে যখন তিনি অন্য কোন জাতিকে উত্থিত করেন, তখনে পরবর্তী জাতিকে পূর্ববর্তীর খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত বলেই পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

খলীফা প্রধানতঃ দুই প্রকার। আল্লাহতায়ালার তরফ থেকে প্রেরিত প্রত্যেক নবী-রসুলই আল্লাহর খলীফা। বিভিন্ন যুগ ও জাতির প্রয়োজনে আল্লাহতায়ালার নির্দেশিত পথে মানুষকে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরিত সমস্ত নবী-রসুল

প্রকৃত অর্থেই খলীফাতুল্লাহ্। দ্বিতীয় প্রকার খলীফা হলেন নবীর স্থলাভিষিক্তগণ, যাঁরা নবীর মৃত্যুর পর আল্লাহতায়ালার দ্বীন ও বিশ্বাসীদের সঠিক পরিচালনার জন্য আল্লাহতায়ালা কতৃক মনোনীত হন। ইসলামের পরিপূর্ণ সেবা ও ইসলামী জীবন বিধানের সঠিক রূপ প্রদান করাই নবী, রসুল এবং তাঁদের খলিফাদের আরব্ধ কাজ।

খেলাফত কায়েম রাখার প্রতিশ্রুতি :

স্থান, কাল ও পাত্রভেদে আল্লাহতায়ালা সকল কালের বিশ্বাসী সৎকর্মশীল লোকের জন্য খেলাফত কায়েম রাখার ওয়াদা করেছেন। তাই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন :

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصلحات ليستخلفنهم فى الارض
كما استخلف الذين من قبلهم ০ (সুরা নুর ৫৬, আয়াত)

"ওয়াদাল্লাজীনা আমানু মিনকুম ওয়া আমিলুস সালিহাতি লাইয়াস-তাখলিফান্নাহুম ফিল আরজি কামাস তাখলিফাল্লাজিনা মিন কাবলিহিম" (সুরা নূর, ৫৬ আয়াত)

অর্থাৎ, "আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের মধ্য থেকে বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল লোকদের সঙ্গে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি এই পৃথিবীতে তাদের মধ্যে অবশ্যই খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন যদ্রূপ তিনি পূর্ববর্তীদের মধ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।" এই আয়াত থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, খিলাফত একটি চিরস্থায়ী ঐশী সংগঠন। যদ্দিন পর্যন্ত বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল লোক থাকবে এবং তারা এই ঐশী সংগঠন কায়েম থাকার প্রতি বিশ্বাসী থাকবে, তদ্দিন আল্লাহতায়ালা একে কায়েম রাখবেন। এই প্রসঙ্গে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর এক হাদীসও প্রনিধানযোগ্য। তিনি ভবিষ্যদ্বানী করে বলেছিলেন, "প্রথমে নবুয়ত, তারপর রাজতন্ত্র, তারপর বিচ্ছিন্ন শাসন ব্যবস্থা কায়েম হবে। অতঃপর নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে"। (মেশকাত)। ইসলামের এই প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের খোলাফায়ে রাশেদা প্রকৃত প্রস্তাবে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রচারিত ধর্মকে সঠিক ভাবে সংস্থাপিত করবেন এবং তাঁদের কর্মকাণ্ডও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সুন্নত বা আদর্শের অন্তর্গত হবে। এ সমস্ত রাশেদ (হেদায়েত প্রাপ্ত) খলীফার পথের অনুসরণ করা ও তাঁদের মা'রুফ ফায়াসালাকে (যা স্বতঃ-সিদ্ধরূপে মা'রূফই হইয়া থাকে) নতমস্তকে বরণ করা প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য ঠিক তদ্রূপ জরুরী, যেরূপ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আদেশ বা নিষেধ মান্য করা তাদের জন্য জরুরী। খেলাফতের চিরন্তন শৃঙ্খল এবং খলিফাগণের এতায়াত বা আজ্ঞা পালন সম্বন্ধে বহু হাদীস রয়েছে। আমরা আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি মূল হাদীসের উল্লেখ করছি :

(১) "মা কানাত নাবুয়াতুন কাতু ইল্লা তাবিয়াত হা খিলাফাতুন"—অর্থাৎ, এমন কোন নবুয়ত ছিল না যার পরবর্তীতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত না হয়েছে, (এবং আমার পরেও খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে)। (জামেউছ ছগীর, ছাইয়ূতী)।

(২) "উসীকুম বে তাক্ওয়াল্লাহে ওয়াস সামযে ওয়াত তায়াতে ওয়া ইন্ কানা আবদান হারশীয়া"—অথাৎ, তোমাদিগের প্রতি আমার এই উপদেশ যে, তোমরা আল্লাহতায়ালার তাকওয়া অবলম্বন কর এবং এতায়াত ও ফরমাবরদারীতে সবিশেষে যত্নবান হও, যদিও কিনা একজন হাবশী গোলাম তোমাদের উপর নিযুক্ত হয়।

(৩) "আলাইকুম বে সুন্নতি ওয়া সুন্নাতিল খোলাফায়ের রাশেদীনাল মাহদীনা।—অর্থাৎ, (আমার পরে যখন যখন ধর্মীয় বিষয়ে বিভিন্ন মতভেদ ও রুসম-রওয়াজ দেখা দিবে, তখন) তোমরা সুন্নত (আদর্শ) ও আমার পরবর্তী সত্যনিষ্ঠ ও সৎপথ-প্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নতের উপর কায়েম থাকবে।

(৪) 'তামাস্সাকু বিহা'—অর্থাৎ, তোমরা তাদের আদর্শকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরবে।

(৫) "ওয়াযযু আলাইহা বেন্ নওয়াসি"—অর্থা, মজবুত ভাবে ধরে থাকবে যেমন কোন জিনিষকে দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে ধরা হয়।

(৬) "ওয়া ইয়াকুম ওয়া মুহ্দাছাতিল উমুরে"—অর্থাৎ প্রত্যেক নব বিধান (যা আমার ও আমার খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ বিরোধী) থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা তা বেদাত)

(৭) "কুল্লু বেদাতুন যালালাতুন ফিন্নার"—এবং প্রত্যেক আদর্শ বিরোধীতাই (বেদাত) পথ-ভ্রষ্টতা যার পরিণাম হচ্ছে দোযখ।

(আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনে মাজা, মসনদ আহমদ বিন হাম্বল)।

পবিত্র কোরআন ও হাদীসের উল্লেখিত বর্ণনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, খিলাফত ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই পৃথিবীর বুকে হযরত আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে ইহার শুরু বা ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে এবং পৃথিবীর বুকে যদ্দিন প্রকৃত বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল লোক থাকবে, তদ্দিন এই সিলসিলা স্থায়ী থাকবে। অন্য কথায় খেলাফতের দ্বারাই প্রকৃত বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের জামাত গঠিত হতে থাকবে।

খলীফার 'মোকাম' বা মর্যাদা :

নবীগণের মিশনের পূর্ণতা তাদের উত্তরাধিকারী খলিফাগণের সহিত সম্পর্কিত। বস্তুতঃ নবী-রসুলগণ আল্লাহ্র তরফ হতে 'প্রথম কুদরত' ও খলীফাগণ 'দ্বিতীয় কুদরত' হিসাবে আবির্ভূত হন—পরিণামে নবীর মিশনের আপাতঃ অসম্পূর্ণ উদ্দেশ্যাবলী খলিফাগণের মাধ্যমেই সম্পূর্ণতা লাভ করে। খলীফার এই উচ্চ মর্যাদা বা মোকামের প্রতি লক্ষ্য রেখেই মসীহ্ মাওউদ হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) খলীফাকে রসুলের 'যিল' বা প্রতিবিম্ব বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং খেলাফতের আশিসকে কেয়ামত পর্যন্ত প্রবহমান স্থায়ী কল্যাণ বলে অভিহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিম্নলিখিত উক্তি প্রতিধানযোগ্য :

"যেহেতু কোন মানুষকে চিরস্থায়ী জীবন দান করা হয় না, তাই আল্লাহ্তায়ালা ইচ্ছা করেছেন যে, নবীগণের সত্তা যা পৃথিবীর সকল সত্তা অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদাশীল এবং সর্বোত্তম, তা কেয়ামত পর্যন্ত সর্বদা প্রতিবিম্ব-স্বরূপ কায়েম রাখবেন। এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহতায়ালা খেলাফতের ব্যবস্থা করেছেন যেন দুনিয়া কখনো এবং কোন যুগে রেসালতের বরকত থেকে বঞ্চিত না হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি খেলাফতকে শুধুমাত্র ৩০ বছর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ বলে মনে করে সে নিজ অজ্ঞতাবশতঃ খেলাফতের মুখ্য উদ্দেশ্যকেই উপেক্ষা করে..... "। ['শাহাদাতুল কোরআন, পৃঃ ৫৮]

খলীফার নির্বাচন, কার্যকাল ও দায়িত্বাবলী :

নবীর ইনতেকালের পর বাহ্যিক ভাবে অধিকসংখ্যক বিশ্বাসীর প্রত্যক্ষ ভোটে খলীফার নির্বাচন হলেও আসলে খোদার ইঙ্গিতেই এই নির্বাচন সুসম্পন্ন হয়। মুসলমানদের ভোট প্রদান যেন বাইরের থেকে দৃশ্যমান কোন পর্দা যার অন্তরালে খোদার হস্ত কার্যশীল। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর বিভিন্ন খোলাফায়ে রাশেদার নির্বাচনের সময় এই সত্যকেই আমরা প্রতিভাত হতে দেখি। বিশেষ করে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নির্বাচন প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁর রোগশয্যার একবার বিবি আয়েশাকে (রাঃ) লক্ষ্য করে তাঁর বাপ ও ভাইকে ডেকে আনতে বলেন যাতে হযরত আবু বকরের (রাঃ) নামে খিলাফতের ফরমান লিখিয়ে দেওয়া যায়। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে তিনি পর মুহূর্তে বলেন যে, খলীফা নির্বাচন করা আল্লাহ্রই কাজ এবং একাজ তিনিই সম্পন্ন করবেন। তবে মুসলমানদের সর্বাধিক হিতকামী ব্যক্তি হিসাবে হযরত আবু বকর (রাঃ)-কেই যে তাঁরা খলিফা নির্বাচন করবেন, এ ব্যাপারে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্থির-নিশ্চিত ছিলেন।

আঁ-হযরত (সাঃ) কেন তাঁর পর খলীফা নির্বাচন করেন নাই, এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ উক্তি রয়েছে। তিনি বলেন : "এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এই ছিল যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ভালভাবেই জানতেন যে স্বয়ং আল্লাহতায়ালা খলীফা নিয়োগ করবেন; কেননা খলীফা নির্বাচন খোদার কাজ এবং খোদার নির্বাচন ত্রুটিমুক্ত। সুতরাং আল্লাহ্তায়ালা হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে এই কাজের জন্য খলিফার মোকামে দাঁড় করিয়ে সর্ব প্রথমে হক বা সত্যকে তাঁর হৃদয়ে ঢেলে দেন।" [মলফুজাত, ১০ম খণ্ড ২৩০ পৃষ্ঠা]। হযরত ওমরে (রাঃ)-এর খেলাফতের শেষের দিকে একদল মোসলমান তাঁর পরবর্তী খলীফা নির্বাচন করার জন্য তাঁকে আবেদন জানিয়েছিল। এর প্রতি উত্তরে খলীফা একদিন জুমার খোতবায় বলেন : "মুসলমানগণ আমাকে আমার প্রতিনিধি নির্বাচন করার জন্য দাবী করছে। স্মরণ রেখ, মৃত্যু, ধর্ম এবং খেলাফত কোনটারই আমি মালিক নই। আল্লাহ্ই তাঁর দ্বীন এবং খেলাফতের রক্ষক"। ['মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা', পৃঃ ৪২]।

খিলাফতে রাশেদার নির্বাচন যেহেতু ঐশী ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়, সেজন্য বাহ্যিক ভাবে ভোট প্রদানের মাধ্যমে খলীফার নির্বাচন হলেও ভোটাভোটি করে সেই খলীফাকে আবার অপসারন করা যায় না। তাই নির্বাচিত খলিফা আজীবন তাঁর পদে বহাল থাকেন। অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রধানের মত তিনি জনগণের চাপে পদত্যাগও করতে পারেন না। এ প্রসঙ্গে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালীন ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। বনী উমাইয়া ও বনী হাশেমের বিরোধ, কোরায়েশ ও অ-কোরায়েশের দ্বন্দ্ব এবং আরব ও অনারবের সংঘাতকে কেন্দ্র করে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফতের সময়ে নেযামে-খেলাফত ও ইসলামকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের এক অবাঞ্ছিত জোট সৃষ্টি হয়, যার পরিনতিতে হযরত ওসমান (রাঃ) শাহাদত বরণ করেন। অবশ্য আবদুল্লাহ ইবনে সাবা নামক এক নব-দীক্ষিত মুসলিম (যে ব্যক্তি ইহুদী ধর্ম থেকে ইসলামের ক্ষতি সাধনের জন্যই মুসলমান হয়েছিল) ও তার অনুসারী কিছু দুস্কৃতিকারীই প্রকৃতপক্ষে এই দুঃখজনক ঘটনার জন্য দায়ী ছিল। তাদের নেতৃত্বেই বিদ্রোহকারীগণ খলিফার গৃহ অবরোধ করে এবং তাঁর পদত্যাগ দাবী করে। প্রতি উত্তরে হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন : "আমার যতক্ষণ শ্বাস আছে, ততক্ষণ আল্লাহ্‌র দেওয়া এই ভূষণ আমি নিজ হাতে ছিন্ন করতে পারি না। আল্লাহ্ আমাকে খেলাফতের যে নেয়ামত দান করেছেন এর থেকে সরে দাঁড়ানোর চেয়ে মৃত্যুবরণ করাই আমার জন্য শ্রেয়।" [তাবারী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১২১]। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁর নিকট বর্ণিত হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর এক হাদিসের আলোকেই উপরোক্ত জবাব দিয়েছিলেন। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) একবার তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আল্লাহ্ তোমাকে এক চাদর পরাবেন যা লোকে তোমার নিকট থেকে কেড়ে নিতে চাইবে। কোন অবস্থাতেই তুমি তাদেরকে তা খুলে দেবেনা।" [তিরমিযি, ২য় খণ্ড – হযরত ওসমানের চরিত্র অধ্যায়]

যেহেতু খলিফাদের নির্বাচন ঐশী ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়, তাই নির্বাচিত খলীফার মন ও মেজাজ আজীবন আল্লাহ্‌তায়ালাই নিয়ন্ত্রন করেন। এজন্য খলীকার অন্তরে সাহসিকতা ও সুক্ষ্মদর্শিতার রূহ প্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া হয় যা ইতিপূর্বে তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। জীবনের চরম বিপদের মোকাবিলায়ও তাই খলীফা ধৈর্যহারা হন না এবং ইসলামের সেবা এবং আল্লাহর হুকুমকেই তাঁরা সর্বাধিক প্রাধান্য দান করেন। আমরা এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইসলামের প্রথম পর্যায়ের খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবন থেকে দু একটি ঘটনার উল্লেখ করছি :

(১) হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌তায়াল, তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে খলীফা মনোনীত করেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) প্রকৃতিগত দিক থেকে অত্যন্ত কোমল স্বভাবের লোক ছিলেন। কিন্তু খলীফা নির্বাচনের পর আল্লাহ্-তায়ালা তাঁর হৃদয়ে সাহসিকতা ও সুক্ষ্মদর্শিতার এমনি প্রভাব সৃষ্টি করে দেন যা সত্যই

বিস্ময়কর ছিল। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ওফাতের সাথে সাথে বেদুঈনদের যাকাৎ প্রদানে অস্বীকৃতি, মিথ্যা নবুয়তের দাবীকারকদের ফেতনা ও সিরীয়ার সীমান্তে বিধর্মীদের সামরিক তৎপরতা একযোগে উত্থাপিত হয়ে ইসলামের জন্য এক বিরাট সঙ্কট সৃষ্টি করে। হযরত আবু বকর (রাঃ) নির্ভীক পদক্ষেপ ও দৃঢ়তার সাথে এ সমস্ত বিপদাবলীর মোকাবিলা করেন। আল্লাহ্‌তায়ালা পরিণামে হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক গৃহীত সমস্ত পদক্ষেপকেই ইসলামের জন্য সফল ও মঙ্গলময় করেন। এ সময়কার ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনায় বিবি আয়েশা (রাঃ) বলেন, "বেদুঈনদের এবং মিথ্যা নবুয়তের দাবী কারকদের ক্রমাগত ফেতনা ও বিদ্রোহ সৃষ্টির জন্য যে ভয়ানক বিপদাবলী উপস্থিত হয়েছিল, তা যদি কোন পাহাড়ের উপরও পতিত হত, তাহ'লে সেটা ধ্বসে মাটির সংগে মিশে যেত।" ['তোহফায়ে গুলড়বিয়া, পৃঃ ৫৮]। আল্লাহ্ তাঁর খেলাফতের কল্যাণেই হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সমস্ত কার্যক্রম সাফল্যমণ্ডিত করেছিলেন।

(২) হযরত আলী (রাঃ) আততায়ী কতৃর্ক ভীষণভাবে আহত। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হতে যাচ্ছে। এই অবস্থায় তিনি তাঁর পুত্র হযরত হাসান (রাঃ)-কে ডেকে বল্লেন, "হাসান! তোমরা আমার হত্যাকারীকে ছাড়া আর কাউকে হত্যা করো না। তবে তোমরা যদি আমার ঘাতককে মাফ করে দাও, ইহা তাক্‌ওয়ার (খোদা-ভীতির) খুব নিকটবর্তী হবে! দেখ! বাড়াবাড়ি করো না, আল্লাহ্‌তায়ালা বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না।" [তাবারী ও ইবনে সা'দ]

বস্তুতঃপক্ষে খলীফাগণ আমৃত্যু ঐশী ইঙ্গিতেই তাঁদের দায়িত্ব পালন করে যান। তাঁদের চারিত্রিক পবিত্রতা ও কর্তব্যানুভূতি এত উঁচু পর্যায়ের হয়ে থাকে যার তুলনা অন্য কোন শাসক বা শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁদের সুযোগ্য নেতৃত্বের ফলেই ইসলাম ক্রমাগতভাবে উন্নতি লাভ করতে থাকে। খিলাফতের বরকতের ফলেই এই উন্নতি সম্ভব হয়।

খিলাফত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কুফল ঃ

বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, মুসলমানদের খেলাফত-রূপী স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠান নিজেদের কোন্দল ও আত্মঘাতী প্রচেষ্টার ফলে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মৃত্যুর মাত্র তেত্রিশ বছর কালের মধ্যে সাময়িকভাবে কর্তিত হয়ে যায়। এর একটি প্রধান কারণ ছিল এই যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) -এর সময়কার অনেক সাহাবী, যাঁরা তাঁর পবিত্র জীবনের আদর্শে জীবন গঠন ও ঐক্যের মহান শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই ক্রমশঃ মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছিলেন। পরবর্তী বংশধরগণ অনেকেই তাকওয়া এবং ঐক্যের প্রশ্নে তাঁদের যথাযোগ্য উত্তরাধিকারী হতে

পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইসলামের ব্যাপক অগ্রগতি ও সাফল্য দেখে পরবর্তী পর্যায়ে যে সব ইহুদী ও খৃষ্টান ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের তরবিয়তের উত্তম ব্যবস্থা করা হয় নাই। তাদের মধ্যে দলাদলি, স্বার্থপরতা ও ক্ষমতালাভের চেষ্টা বিরাজমান ছিল। অনেকের ইসলাম গ্রহণ ছিল শুধু লোক দেখানো, ভিতরে ভিতরে তারা ইসলামের সংহতি ও একত্ব নষ্ট করার জন্য গোপন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। এদের স্বার্থান্ধতা ও অপচেষ্টার ফলেই হযরত ওমর (রাঃ) থেকে শুরু করে পর পর তিন খলীফাকে শাহাদতের পিয়ালা পান করতে হয়। এভাবে হযরত আলী (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর থেকে মুসলমানদের সম্মিলিত সংগঠন নষ্ট হয়ে যায়। এর পর খেলাফতের নামে রাজতন্ত্র চালু হয়। বনী উমাইয়া ও বনী আব্বাসের বংশধর দ্বারা শাসিত হবার পর মুসলমানগণ আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আব্বাসীয় যুগের পর তাই মিশরের ফাতেমী বংশ, স্পেনের উমাইয়া শাসক ও তুরস্কের ওসমানীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের পর এসব শাসকদের রাজ্য-শাসন ব্যবস্থা ছিল মুলতঃ মুসলিমদের রাজনৈতিক ইতিহাস। ধর্মীয় দিক থেকেও মুসলমানরা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সুন্নীরা উমাইয়া এবং আব্বাসীয়া বংশের শাসকদেরকে খলীফারূপে মেনে নেয় এবং শিয়ারা হযরত আলী (রাঃ)-এর বংশধরদের মধ্যে ইমামতকে সীমাবদ্ধ রাখে। পরবর্তী পর্যায়ে এই উভয় দলের মধ্যে বিভিন্ন পণ্ডিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামে আরো বহু দল ও উপদলের সৃষ্টি হয়। এভাবে প্রকৃত খেলাফত থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে জাগতিক ও ধর্মীয় উভয় দিক থেকে মুসলমানদের একতা ও সংহতি বিনষ্ট হয়ে যায়।

বিভিন্ন সময়ে অনেক মুসলমান পণ্ডিত মুসলমানদের সম্মিলিত সংগঠন নষ্ট হয়ে যাওয়ার বিভিন্ন কুফল সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। খিলাফত ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এটা ইসলাম-রূপ জীবনের জীবন-শিরা। খেলাফতকে বাদ দিয়ে ইসলাম টিকে থাকতে পারে না। সার্বিক বিশ্লেষণে খিলাফত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কয়েকটি প্রধান কুফল নিম্নে বর্ণিত হলো :—

১। এতে মুসলমানদের একতা ও সংহতি বিনষ্ট হয়ে যায়; (২) মুসলমানদের সার্বিক ও অভিন্ন নেতৃত্বের বিলোপ এবং নেতার প্রতি মুসলমানদের সম্মান, সম্ভ্রমবোধ ও এতায়াতের মনোভাব ক্ষুন্ন হয়; (৩) খিলাফতের পরিবর্তে রাজতন্ত্র কায়েম হয়; (৪) মুসলমানদের অগ্রাভিযান ও কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে; (৫) ইসলামের তবলিগী প্রচেষ্টা একদম নিশ্চল অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

বস্তুতঃ সারা বিশ্বের মানবজাতিকে এক ধর্ম ও একই স্রষ্টার উপাসক তথা উম্মতে ওয়াহেদা প্রতিষ্ঠার জন্য যে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল, খিলাফত থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে মুসলমানগণ সেই সত্যিকারের ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে পড়ে।

নবুয়তের পদ্ধতিতে পুনরায় খেলাফতে রাশেদার প্রতিষ্ঠা :

খিলাফতের ওয়াদা আল্লাহ্‌তায়ালা প্রকৃত বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের সঙ্গে করেছিলেন। তাই পৃথিবী থেকে যখন প্রকৃত ঈমান বা বিশ্বাস এবং ফলতঃ সৎ-কর্ম তিরোহিত হয়ে যায়,

মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হয় এবং আল্লাহ্‌তায়ালার মনোনীত খিলাফত পুনরায় তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন করে। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের সুরা আস্‌সেজদাতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। আমরা মেশকাত শরীফের এক হাদীস পূর্বেই উল্লেখ করেছি যেখানে প্রথমে নবুয়ত, তারপর খিলাফত, তারপর রাজত্ব, তারপর বিচ্ছিন্ন শাসন, এবং সর্বশেষে 'খিলাফত আলা মিন-হাজিন নবুয়ত' বা 'নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত' প্রতিষ্ঠিত হবার ভবিষ্যদ্বানী রয়েছে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) নবুয়তের মাধ্যমে পরবর্তী জামানায় খিলাফত প্রতিষ্ঠাকার কে 'খলিফাতাল্লাহিল্ মাহ্‌দীউ', নামে অভিহিত করেছেন। (আহমদ, বয়হকী ও ইবনে মাজা)। তাহারা সুরা জুময়ার 'ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহীম' আয়াত, সুরা নুরের 'আয়াতে ইস্তেখলাফ' ও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বিভিন্ন হাদিসের আঙ্গিকে একথা প্রমাণিত হয় যে, পারস্য-বংশোদ্ভুত এক প্রতিশ্রুত ব্যক্তির মধ্য দিয়ে মহানবী সাঃ) এর আত্মিক বিকাশ হবে এবং তাঁর দ্বারা পুনরায় পৃথিবীতে নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও ধর্মের সঞ্জীবন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার "ইউহিদ্-দিনা ওয়া ইউকিমুশ শরিয়াতা"—এই উদ্দেশ্যে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) ও তাঁর খলীফাগণ কাজ করে যাবেন। আল্লাহ্ ও রসুল (সাঃ)-এর এই পবিত্র ওয়াদা অনুযায়ী যথাসময়ে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাব হয়েছে। তিনিই আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)। তিনি তাঁর সার জীবনের সাধনা দিয়ে পবিত্র কুরআন ও রসুল করীম (সাঃ)-এর আদর্শকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করে দেখিয়েছেন। ১৯০৮ সালে তাঁর মৃত্যুর পর 'কুদরতে সানিয়া' সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মৌলানা হাকীম নুরুদ্দীন (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হন। খলিফাতুল মসীহ আউয়াল (রাঃ) ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন এবং তারপর হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর প্রতিশ্রুত পুত্র হযরত মীর্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) দ্বিতীয় খলিফার পদ অলঙ্কৃত করেন। সুদীর্ঘ ৫২ বছর পর্যন্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ বিশ্বব্যাপী ইসলামের পুণঃপ্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ প্রচারের কার্যে আত্ম-নিয়োগ করেছেন। ১৯৬৫ সালে খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ইন্তেকাল করেন এবং তারপর খলিফাতুল মসীহ সালেস হযরত হাফেজ মীর্যা নাসের আহমদ (আইয়েদাহুল্লাহুতালা) খলিফা হিসাবে নির্বাচিত হন।

খেলাফতের আশিস বা বরকত :

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ ছিল প্রকৃত অর্থে ইসলামের স্বর্ণ-যুগ। তাঁদের সময়ে তৎকালীন জানা পৃথিবীতে ইসলাম তার সাম্য ও একতার বাণী নিয়ে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেছিল। ঠিক সেভাবে দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলাফতও আজকের বিশ্বে সত্যিকারের ইসলামের খেদমতের জন্য সর্বপ্রকার

বাধা-বিপত্তি সত্বেও উন্নতির পর উন্নতি সাধন করে চলেছে। আজ সারা পৃথিবীতে ৫০ টির মত দেশে আহ্‌মদী জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ্‌তায়ালার তৌহিদ প্রচারার্থে এ সমস্ত দেশে বহু মসজিদ নির্মিত হয়েছে। সমাজ-সেবা ও খেদমতে-খালকের জন্যও এসমস্ত দেশে আহ্‌মদী জামাত কর্তৃক অনেকগুলো স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে জামাতের কেন্দ্র পাকিস্তানের রাবওয়ায় মুবাল্লিগদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং প্রচারক হিসাবে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয়। কেন্দ্র থেকে এবং স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন দেশ থেকে ইসলাম ও আহ্‌মদীয়াতের উপর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা হচ্ছে। বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও তফসির প্রকাশ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। আজ থেকে মাত্র ৯০ বছর পূর্বে কাদিয়ানের এক নিভৃত পল্লী থেকে যে একক ক্ষীণ কণ্ঠ ঐশী ইঙ্গিতে ইসলামের সংস্কারের জন্য দাঁড়িয়েছিল, তাঁর অনুসারীর সংখ্যা আজ এক কোটী অতিক্রম করে গিয়েছে। আগামী ১৯৮৯ সনে শতবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে জামাতের বর্তমান খলীফা এক বিরাট কর্মসূচী নিয়েছেন। এর মধ্যে ২০টি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ, ১০০টি বিভিন্ন ভাষায় ইসলামের পত্র-পত্রিকার প্রকাশ, এবং মসজিদ ও মিশন স্থাপন উল্লেখযোগ্য। মোট কথা, রাজা-বাদশাহ ও রাষ্ট্র-শাসকগণ ইসলামের খেদমতের জন্য বিগত এক হাজার বছর যাবত যা করতে সক্ষম হন নাই, খিলাফতের মাধ্যমে আহ্‌মদী জামাত তার চেয়ে বেশী কাজ এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন করেছে। ইসলামের যে শক্তি পৃথিবীতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, পুণঃপ্রতিষ্ঠিত খেলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে তা আবার সুসংহত হতে যাচ্ছে। ইনশাআল্লাহ্‌ অদূর ভবিষ্যতে এর মাধ্যমে এই বিচ্ছিন্ন জন-মণ্ডলী একই আল্লাহতায়ালার অধীনে একই জাতিতে পরিণত হবে। (তাযকেরা)

কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় :

১। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর খেলাফতের সিলসিলা (খলিফাতুর রসুল) ৩০ বছর কার্যকরী থেকে সাময়িকভাবে বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই যুগে পুনরায় নবুয়তের পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত খেলাফত কেয়ামত পর্যন্ত বিনষ্ট হবে না। ('আল্ অসিয়ত')

২। খলিফাগণ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে 'দ্বিতীয় কুদরত' হিসাবে আবির্ভূত হন। খেলাফতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ওয়াদা অনুযায়ী তাঁর মনোনীত ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও সংস্কারের কাজ সম্পন্ন হয়। তাছাড়া, নবীর মৃত্যুর পর যে ভয় ও শূন্যতার সৃষ্টি হয়, খলীফা নির্বাচনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ সেই ভয়ের পরিবর্তে নিরাপত্তা প্রদান করেন। (সুরা নূর)

৩। খলীফা নির্বাচন করা আল্লাহ্‌র কাজ, এটা কোন মানুষ বা আঞ্জুমানের এখতিয়ারে নেই। কোন খলীফার জীবদ্দশায় অন্য কোন খলীফা হতে পারে না। যখন কোন খলীফা

মারা যান, তখন ঐশী ইঙ্গিতে এমন একজন এই মোকামে উন্নীত হবেন যিনি আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত। (খলীফাতুল মসীহ আউয়াল—রাঃ)।

৪। শুধু নামায পড়ান বা বয়াত গ্রহণ করাই কোন খলীফার কাজ হতে পারেনা। আর প্রকৃত বয়াতের সাথে কামেল এতায়াত সম্পর্কিত। এতায়াতের প্রশ্নে খলীফার রায় বা মতকে অবশ্যই শিরোধার্য করে নিতে হবে (খলীফাতুল মসীহ আওয়াল—রাঃ)।

৫। প্রবৃত্তিকে কখনো নিজের উপর প্রাধান্য দিতে নেই। যদি কোন বিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত হয়, তার ফয়সালার জন্য অবিলম্বে খলীফায়ে-ওয়াক্তের শরণাপন্ন হতে হবে। (হযরত মোসলেহ্ মওউদ—রাঃ)।

৬। ধর্মের সংস্কারের জন্য একসাথে একাধিক মোজাদ্দেদের আবির্ভাব হতে পারে, কিন্তু একসাথে একাধিক খলীফা হতে পারে না। মর্যাদায় মোজাদ্দিদের চেয়ে খলীফা অনেক বড়। খেলাফত ব্যবস্থার নিরবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খল প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর পৃথকভাবে আর কোন মুজাদ্দিদ হবেন না। (হযরত মোসলেহ্ মওউদ—রাঃ)।

৭। খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় যে ধরনের ফেৎনার উদ্ভব হয়েছিল, ভবিষ্যতে আমাদের মাঝেও এই ধরনের ফেৎনার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য ভালভাবে যাচাই না করে আমরা যেন কোন অপ-প্রচারে প্রভাবান্বিত হয়ে না পড়ি, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তাছাড়া প্রত্যেক আহমদীর সাধ্যমত কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ রাখা উচিত এবং সালানা জলসা ও জামাতী কার্যক্রম উপলক্ষে ব্যক্তিগতভাবে খলীফায়ে ওয়াক্ত ও কেন্দ্রের বুজুর্গদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা উচিত (হযরত মোসলেহ্ মওউদ—রাঃ)।

৮। অচিরেই পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চল এই খেলাফতের কল্যাণে আহমদীয়াতের সত্যতা উপলব্ধি করবে এবং পৃথিবীতে এক আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধিত হবে। এই উদ্দেশ্যে চরম কোরবানীর জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ধৈর্য ও প্রার্থনা যেন আমাদের সব সময়ে সাথী হয়। যত বিপদই আসুক না কেন, আমাদের মুখের হাসি যেন কেউ কেড়ে নিতে না পারে। (খলীফাতুল মসীহ সালেস—আইঃ)।

৯। জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপন একমাত্র খিলাফতের মাধ্যমেই সম্ভব। একমাত্র খিলাফতের মাধ্যমেই সার্থকভাবে ইউ,এন,ও, বা জাতিসংঘের উদ্দেশ্য সম্পাদিত হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে বিশ্বাসী রাষ্ট্রগুলির উপর নিগরানী করা এবং তাদের পরস্পরের ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা করার দায়িত্ব খলিফায়ে-ওয়াক্তের। (সুরা হুজুরাত)।

১০। ঈমানদার বা বিশ্বাসী—সে যে দেশেরই হোক—তার সাথে খলিফার সম্পর্ক বিদ্যমান, তাই খলিফাকে 'আমীরুল মুমেনীন' বলা হয়। খলীফায়ে ওয়াক্তের এতায়াত ছাড়া কেউ সঠিক পথ-প্রাপ্ত হতে পারে না। কুরআনে বর্ণিত ইবলিস আল্লাহতে বিশ্বাসী হয়েও শুধুমাত্র আল্লাহর খলিফার এতায়াত না করায় পথ-ভ্রান্ত হয়েছিল। (সুরা বাকারা)

১১। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, খিলাফতের যথাযথ স্বীকৃতির মাধ্যমেই ইসলামের মহা-নাগরিকত্ব লাভ হয়ে থাকে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক এ যুগে নবুয়তের পদ্ধতিতে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই খিলাফতের স্বীকৃতি প্রকৃত প্রস্তাবে মসীহে মওউদের (আঃ) স্বীকৃতি, মসীহে মওউদের (আঃ) স্বীকৃতি হচ্ছে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার স্বীকৃতি এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর স্বীকৃতি হচ্ছে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তওহীদের স্বীকৃতি। একইভাবে খলিফাতুল মসীহ-এর অস্বীকৃতি পরিণামে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অস্বীকৃতির নামান্তর। তাই, যারা খোদার নির্বাচিত খলিফাকে অস্বীকার করে, তারা আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে উদাসীন। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে এই বিষয়টি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করার তওফীক দিন (আমিন)।

আমরা ইসলামে খিলাফতের গুরুত্ব এবং অপরিহার্যতা বিষয়ে যতটুকু আলোচনা করেছি তার থেকে এ সত্য প্রতিভাত হয় যে, খিলাফত ছাড়া ইসলামের অবস্থা চালক-বিহীন নৌকার অনুরূপ। যেখানে বাহ্যিক ভাবে ছোট থেকে ছোট কোন সংগঠন বা সংস্থাও নেতা ছাড়া চলতে পারে না, সেখানে বিশ্বমানবের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবন বিধান পরিচালনার এন্য একজন সুযোগ্য পরিচালকের আবশ্যকতা একান্তই অনস্বীকার্য। নবীর অবর্তমানে খলীফাই হচ্ছে সেই পরিচালক। তাই ইসলামের উন্নতি ও ইসলামী জীবনের বাস্তবায়ন যদি আমাদের কাম্য হয়, তা'হলে সকল মুসলমানকে তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা বিসর্জন দিয়ে এক খলীফার অধীনে কাজ করে যেতে হবে। এ প্রসঙ্গে মোসলেহ মওউদ হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর একটি উপদেশ স্মর্তব্য : "হে বন্ধুগণ! আমার শেষ উপদেশ এই যে, সমস্ত বরকত খিলাফতের মধ্যে রয়েছে। নবুয়ত একটা বীজের ন্যায় হয়ে থাকে, যার পর খিলাফত তার প্রভাবকে জগতে প্রতিফলিত করে। তোমরা খিলাফতকে শক্তভাবে ধারণ কর এবং এর আশিস দ্বারা দুনিয়াকে পরিপূর্ণ করতে থাক, যাতে খোদাতায়ালা তোমাদের উপর রহম করেন এবং ইহকালে ও পরকালে তোমাদের উন্নতি দেন।" (আল-ফজল, ২০শে মে ১৯৫৯ ইং)।

আসুন, আমরা এই কল্যাণ ও আশিসের উৎসকে কদর করতে শিখি এবং এই খোদায়ী সংগঠন সারা পৃথিবীতে যাতে সুষ্ঠুভাবে কায়েম হতে পারে তারজন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাই ও সব রকম কোরবানীর জন্য প্রস্তুত হই (আমীন)।

— — —

ইসলাম আওর বানীয়ে ইসলাম (সাঃ) সে ইশক

—হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী,
মসীহ মাওউদ ওয়া মাহদী-মাহুদ (আঃ)

হার্ তারাফ্ ফিক্র্ কো দাওড়াকে থাকায়া হামনে।
কো-ই দ্বীন দ্বীনে মুহাম্মদ (সাঃ) সা না পায়া হামনে॥

কো-ই মাযহাব্ নেহী অ্যায়সা কে নিশাঁ দেখলায়ে।
ইয়ে সামার বাগে মুহাম্মদ (সাঃ) সে হী খায়া হামনে॥

হামনে ইসলাম কো খোদ তাজরাবা কারকে দেখা।
নূর হ্যায় নূর—উঠো, দেখো সুনায়া হামনে॥

আওর দ্বীনোঁ কো জো দেখা তো কাঁহী নূর না থা।
কো-ই দেখ্লায়ে আগর হক কো ছুপায়া হামনে॥

আ-ও লোগো! কে এহ্ঁী নূরে খোদা পাও-গে!
লো তুমহেঁ তাওর তাসাল্লী কা বাতায়া হামনে॥

জাব সে ইয়ে নূর মেলা নূরে পয়াম্বর (সাঃ) সে হামেঁ।
যাত সে হাক কী ওয়াজুদ আপনা মেলায়া হামনে॥

মোস্তফা পার তেরা বে-হাদ হো সালাম আওর রাহ্মাত।
উসসে ইয়ে নূর লিয়া বারে খোদায়া হামনে॥

রাব্ব হ্যায় জানে মুহাম্মদ (সাঃ) সে মেরী জাঁ কো মুদাম।
দিল কো উওহ্ জাম লাবালাব হায় পিলায়া হামনে॥

যাঁম্ মেঁ উনকে মসীহায়ী কা দাওয়া মেরা।
ইফতেরা হ্যায় জিসে আজ খোদ্হী বানায়া হামনে॥

গালিয়াঁ সুনকে দোয়া দেতা হুঁ ইন্ লোগোঁ কো।
রহম হায় জোশ মেঁ আওর গাইয ঘাটায়া হামনে॥

তেরে মুহ কী হী কাসাম মেরে পিয়ারে আহ্মদ।
তে-রী খাতের সে ইয়ে সাব বার উঠায়া হামনে॥

তে-রী উলফাৎ সে হ্যায় মা'মুর মেরা হার যার্রা।
আপনে সীনে মেঁ ইয়ে এক শহর বাসায়া হামনে॥

সাফে-দুশমন কো কিয়া হামনে ব-হুজ্জাত পামাল।
সাইফ কা কাম কলম সে হী দেখায়া হামনে॥

নক্‌শে হাস্তী তে-রী উলফৎ সে মিটায়া হামনে।
আপনা হার যাররা তেরী রাহ্‌ মে উড়ায়া হামনে॥

শানে হাক তে-রে শামায়েল মেঁ নাযার আ-তী হ্যায়।
তে-রে পানে সে হী উস যাত কো পায়া হামনে॥

ছু-কে দা-মান তেরা হার দা-ম সে মিলতী হায় নাজাত।
লা-জারাম দার্‌ পে তে-রে সার কো ঝুকায়া হামনে॥

ব-খোদা দিল সে মেরে মিট গায়ে সাব গায়েরোঁ কে নাক্‌শ।
জব সে দিলমেঁ ইয়ে তেরা নাক্‌শ জামায়া হামনে॥

দে-খ্‌ কার্‌ তুঝকো আজব নূর কা জালওয়া দে-খা।
নূর সে তেরে শায়াতী কো জালায়া হামনে॥

হাম হুয়ে খাইরে উমাম তুঝসে হী আয় খাইরে রোসুল।
তে-রে বাঢ়নে সে কাদাম আগে বাড়হায়া হামনে॥

আ-দম যা-দ্‌ তো কিয়া চীয্‌ ফেরেশতে ভী তামাম।
মাদ্‌হ্‌ মেঁ তে-রী উহ্‌ গাতে হ্যাঁয় জো গায়া হামনে॥

কাওম কে যুলুম সে তাঙ্গ্‌ আ-কে মেরে পিয়ারে আজ।
শোরে মাহ্‌শার তে-রে কুচা মেঁ মাচায়া হামনে॥

['দুররে সমীন' থেকে—চয়নকৃত]

তরজমা :

ইসলাম ও ইসলামের প্রবর্তক (সাঃ)-এর প্রতি প্রেম

—হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আঃ)

সকল তরফে চিন্তা ছুটায়ে পেরেশান শেষে ফিরেছি আমি,
মোহাম্মদের ধর্ম ব্যতীত ধর্ম কোথাও পাইনি আমি।

এমন কোন ধর্মই নাই যা' একটি নেশানও দেখাতে পারে,
এ ফল কেবল মোহাম্মদের বাগিচা থেকেই খেয়েছি আমি।

ইসলামকে তো বার বার আমি যাচাই করিয়া দেখেছি স্বয়ং,
আলো, শুধু আলো! ওঠো এবং দেখো!! সবারই কাছে বলেছি আমি।

অন্য তামাম ধর্মে তো আমি দেখিয়াছি আলো কোথাও নাই,
দেখাক না কেউ পারিলে যদি সে সত্যকে করি গোপন আমি।
এসো হে লোকেরা! কেননা কেবল এখানেই পাবে খোদার নূর,
সান্ত্বনার এই পথ তোমাদেরে দেখ বাতলিয়ে দিলাম আমি।
যখন হইতে এ আলো পেয়েছি আলোর নবীর নিকট হ'তে,
সত্যের সেই সত্তা হইতে আপন ওজুদ পেয়েছি আমি।
মোস্তফা 'পরে করুক তোমার সালাম-রহম বেএন্তেহা,
তারই কাছ থেকে এই সব নূর হে খোদা আমার নিয়াছি আমি।
মোহাম্মদের প্রাণে এ প্রাণের মিলন আমার চিরন্তন,
প্রাণ ভরে সেই পেয়ালা হইতে করায়েছি পান দিল্‌কে আমি।
তাদের ধারণা মসিহায়ী এই দাবী আমার,
ইফ্‌তেরা, যাহা তৈরী স্বয়ং করেছি আমি।
গালি শুনিয়াছি তবু হামেশাই ঐ সব লোকে দিয়াছি দোয়া,
রহমতে জোশ ওঠেছে আমার ক্রোধকে নিভায়ে ফেলেছি আমি।
কসম তোমার মুখের জানিও, আমার প্রাণের আহ্‌মদ ওগো,
তোমারই খাতিরে এ দুঃখের ভার বরণ করিয়া নিয়াছি আমি।
তব প্রেম দিয়ে ভরপুর হয়ে উঠেছে আমার প্রতিটি অনু,
বক্ষে আমার বসায়েছি এক প্রেমের শহর স্বয়ং আমি।
দুশমন সবে পরাভূত আমি করেছি দলিল-প্রমাণ দিয়ে,
তলওয়ার দিয়ে যে কাজ হয় তা' কলম দ্বারাই করেছি আমি।
তব প্রেম দিয়ে আমার হাস্তি সাবুন্যে লয় করেছি আমি,
নিজের প্রতিটি অনু-পরমানু উড়ায়েছি তব পন্থে আমি।
তোমার গুণের সুন্দরতায় খোদার মহিমা দেখিতে পাই,
তোমাকে পেয়েছি তাইতে সেই যে অস্তিত্বকে পেয়েছি আমি।
তব আঁচলের পরশ লভিলে চিরতরে মিলে পরিত্রাণ,
তাইতো তোমার দুয়ার—সুমুখে শির ঝুঁকাইয়া দিয়াছি আমি।
কসম খোদার! দিল্‌ থেকে মোর মুছে গেছে সব অন্য ছবি,
যখন হইতে এ দিলে তোমার নক্সা জমায়ে নিয়েছি আমি।

তোমাকে দেখিয়া দেখেছি আজিব অসীম আলোর বিচ্ছুরণ,
তব আলো দিয়ে শায়াতীন সবে জ্বালাইয়া ছাই করেছি আমি।
আমরা হয়েছি খায়রে-উমাম তোমারই তরে হে খায়রে-রোসুল।
তুমি বাড়িয়াছ তাইতো কদম অগ্রে বাড়ায়ে দিয়েছি আমি।
মানব-তনয় তুচ্ছ! স্বয়ং ফেরেশতারাও সবাই আজি,
গাহিছে তাহাই তোমার লাগিয়ে প্রশংসা যাহা গেয়েছি আমি।
জাতির জুলুমে কাতর হইয়া
প্রিয় মোর এবে তোমারই তরে।
তোমারই প্রেমের গলি-পথে আজ
হাশরের শোর তুলেছি আমি॥

(ছুরে সঙ্গীন থেকে, — সংক্ষেপিত)
তরজমা : শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান।

কেবল — নিজামকো

ফোন : ৫০২০৩৩

ইণ্ডেনটিং জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নাম

এস, এ, নিজামী এণ্ড কোম্পানী

আপনার প্রয়োজনীয় তামার তার ও রড, পিভিসি কম্পাউণ্ড ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি, লৌহ ও ইস্পাত সামগ্রী, খেলা-ধুলার সাজ-সরঞ্জাম, বল-বেয়ারিং ও মোটরের যন্ত্রাংশ, মসলাদি, সিনথেটিক রাবার, মেশিনারী যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রাংশ আমদানীতে পরম নির্ভরতার সহিত অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।

১০৭৯, ধানিয়ালা পাড়া, ঢাকা ট্রাঙ্ক রোড,
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

আহমদীয়া জামাতের যুবকদের প্রতি নসিহত

—হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

১। নওনেহালানে জমায়াত মুঝে কুছ্ কাহ্না হ্যায়
পর হ্যায় ইয়ে শর্ত কেহ্, যায়ে' মেরা পয়গাম না হো।

২। চাহ্তা হুঁ কে' কারুঁ চান্দ নাসায়েহ্ তুম্ কো
তাকে ফির বা'দ মেঁ মুঝ্পর কোই ইলযাম না হো।

৩। জব গুজার্ জায়েঙ্গে হাম্, তুম পে পড়েগা সব বার
সুস্তিয়াঁ তরক করো তালেবে আরাম না হো।

৪। খেদমতে দ্বীনকো এক ফজলে ইলাহী জানো
ইসকে বদলে মে কভি তালেবে ইন্য়াম না হো।

৫। খায়ের আন্দেশিয়ে আহবাব রহে মদ্দে নাযার,
আ'য়েব চীনী না' কারো মুফসিদ ও নাম্মাম না' হো।

৬। রাঘবতে দিল সে হো পা-বান্দ নামায ও রোযা
নাযার আন্দায কো-ই হিসসা-য়ে আহকাম না' হো।

৭। পাস হো মাল তো দো উস্সে যাকাত ও সদকা
ফিকরে মিসকীঁ রাহে তুম-কো গমে আই-য়াম না' হো।

৮। আপনী ইস উমর কো নি'মতে উযমা সামঝো
বা'দ মেঁ তা-কে' তুমহেঁ শিকওয়ায়ে আই-য়াম না' হো

৯। উসর হো ইউসর হো তাংগী হো কে' আসায়েশ হো
কুছভী হো বান্দ্ মাগর দাওয়াতে ইসলাম না হো।

১০। কাম মুশকিল হ্যায় বাহুৎ মানযিলে মাকসুদ হ্যায় দুর
আয় মে-রে আহলে-ওয়াফা সুস্ত কভী গাম না হো।

১১। মে-রী তো হক মেঁ তুমহারে ইয়ে দোয়া হ্যায় পিয়ারো
সার পে' আল্লাহ কা সায়া' রাহে না-কাম না' হো।

অনুবাদ ঃ

১। জমাতের নও-জোয়ানগণ! আমার কিছু কথা আছে,
হাঁ, একটি শর্ত আছে যে, আমার কথাগুলি অযথা অপচয় যেন না হয়।

২। আমি তোমাদিগকে কিছু উপদেশ দিতে চাই।
এই জন্য যে পরে যেন আমার উপর কোন প্রকার অপবাদ আসতে না পারে।

৩। যখন আমরা মরে যাব, তখন সকল বোঝা-ই তোমাদের ঘাড়ে ন্যাস্ত করা হবে,
অলসতা পরিহার কর, আরামের তালাশে থাকিও না।

৪। দ্বীনের খেদমত করাকে আল্লাহ্তায়ালার একটা ফজল মনে করবে,
ইহার বিনিময়ে পুরস্কারের আশায় থাকবে না।

৫। বন্ধুর মংগল কামনা-ই যেন তোমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে;
পরচর্চা, পরনিন্দা ও বিবাদ সৃষ্টিকারী হবে না।

৬। বিনা ব্যাতিক্রমে সর্বান্তকরণে নামায ও রোযা করতে থাকবে,
দীনের হুকুমের কোন অংশই যেন তোমার দৃষ্টিতে বাদ না পড়ে।

৭। সম্পদের অধিকারী হইলে উহা হইতে যাকাত এবং সদকা দিতে থাকবে,
সব সময় মিস্কীনের চিন্তা করবে, সম্পদ শেষ হয়ে যাবে এই চিন্তা করবে না।

৮। নিজে এই যৌবন কালকে আল্লাহ্র মহান নে'মত মনে করবে,
বৃদ্ধকালে যেন তোমার জওয়ানীর জন্য আফসোস করতে না হয়।

৯। সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে,
যে কোন অবস্থায় থাক না কেন, ইসলামের দাওয়াত যেন তোমাদের দ্বারা বন্ধ না হয়।

১০। কাজ অত্যন্ত কঠিন, গন্তব্যস্থল বহু দূর;
হে, আমার বিশ্বস্তগণ. তোমাদের গতি যেন কখনো মন্থর না হয়।

১১। আমার প্রিয়গণ, তোমাদের জন্য আমার এই দোওয়া রইল
সর্বদা তোমাদের উপরে আল্লারহর ছায়া থাকুক, অকৃতকার্য যেন না হও।

[অনুবাদ ঃ বারী মাহ্ফুজুল হক]

কলরব ধ্বনি উঠিবে যবে, গোর হতে সবার, রোজ হাশরে।
তব প্রশংসা মুখর সরব গোর খানি, পরিচয় দিবে মোর সবার মাঝারে॥
[আরবী 'দুররে সমীন'] —হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আল্লাহর ইচ্ছায় সন্তুষ্টি

হযরত মীর্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ,
খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(১) হো ফযল তেরা ইয়া রাব ইয়া কোই ইবতেলা হো।
রাযি হ্যায় হাম উসিমেঁ জিসমেঁ তেরি রেজা হো॥

(২) মিট জাউঁ ম্যায় তো উসকি পারওয়াহ্ নাহী হ্যায় কুছভি।
মেরি ফনা সে হাসিল গার দীন কো বাকা হো॥

(৩) সীনা মেঁ জোশে গায়রাত আওর আঁখ মেঁ হায়া হো।
লাব পে হো যিকির তেরা দিলমেঁ তেরি ওকা হো॥

(৪) শায়তান কি হুকুমাত মিট জায়ে ইস জাহাঁ সে।
হাকিম তামাম দুনিয়া পে মেরা মুস্তাফা (সাঃ) হো।

(৫) মাহমুদ উমর মে-রি, কাট জায়ে কাশ ইউঁ হী।
হো রুহ্ মেরি সজেদা মেঁ, আওর সামনে খোদা হো॥

অনুবাদ :

হোকনা তোমার অনুগ্রহ বা বিপদবারি, খোদা!
তাতেই আমার আনন্দ—যদি তোমার সন্তুষ্টি থাকে।
মিশে যাক মোর জীবন তাতে আক্ষেপ নাই
যদি তোমার দ্বীন তাতে প্রাণ পায়।
বুকে মোর "জোশে গায়রত" আর চোখে মোর লাজ থাক
জিবে মোর জপ তব, অন্তর ভরা ওফা রয়।
ধরা থেকে মুছে যাক শয়তানের রাজত্ব
সারা দুনিয়ার হাকিম হউক এবার মোস্তফা (সাঃ) মম।

হে মাহ্মুদ, আয়ু মোর থাক্না চলে এভাবেই
মম খোদা সামনে থাক প্রণতি মোর ইহারই তরে॥

অনুবাদ : নজমুল হক

বসন্তের গজল

—মোঃ ছলিমুল্লা, সদর মোয়াল্লেম

ওরে নৌজুয়ান, ওরে খোদ্দাম,
সাবধান সাবধান,
দিগ-দিগন্ত নব বসন্ত
জীবন্ত অভিযান।

নবীজীর বাগে, উন্মত জাগে,
মৌসুমী সমীরণ,
পাতাহীন গাছে, পল্লব সাজে,
ফল-ফুলে আয়োজন।

দেখ আশে-পাশে, নব উল্লাশে
গাহিছে বিহগ গান,
সবুজের মেলা, পবনের খেলা,
মাতাল করিল প্রাণ।

যুগ ইমামের, পরশে আবার,
জাগিল যাহারা ভবে,
সারাটি দুনিয়া, উঠিল কাঁপিয়া
তাহাদের কলরবে।

দ্বীনের নিশান, করিয়া ধারন,
কোরআন লইবে হাতে,
নিজে শিখে নিবে, অপরে শিখাবে,
মিলে মিশে এক সাথে।

দ্বীন-ইসলামের বসন্ত এল
সারাটি দুনিয়া জুড়ে,
প্রভাতের পাখী ওই ডাকাডাকি,
করিতেছে জোরে জোরে।

———

আপনার তালাশে আছি!

—হযরত মীর্যা মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ)

(১) আপনি কি পরিশ্রম করিতে জানেন? এইরূপ পরিশ্রম যে তের-চৌদ্দ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করিতে পারেন?

(২) আপনি কি সত্যকথা বলিতে জানেন? এইরূপ সত্য কথা যে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়-জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলিতে সাহস করে না এবং কেহ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনাইলে আপনি তাহার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না?

(৩) আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হইতে মুক্ত? মহল্লার গলিতে ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে পারেন? বাজারে উচ্চৈস্বরে সর্ব প্রকার ঘোষণা করিতে পারেন? সমস্ত দিন চলিতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকিতে পারেন?

(৪) আপনি কি এ'তেকাফ করিতে পারেন? এইরূপ এ'তেকাফ যে—

(ক) এক স্থানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এবং দিনের পর দিন বসিয়া থাকিতে পারেন;

(খ) ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া তসবীহ করিতে পারেন এবং

(গ) ঘণ্টার পর ঘণ্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকিতে পারেন।

(৫) আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহণ করিয়া একাকপর্দকহীনভাবে সফর করিতে পারেন?

(৬) কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তাহারা পরাজয়ের নামও শুনিতে পসন্দ করে না। তাহারা পাহাড়-পর্বত কাটিতে তৎপর হয় এবং নদীগুলিকে টানিয়া আনিতে উদ্ধত হইয়া পড়ে। আপনি কি ইহার উপযুক্ত এবং আপনি কি মনে করেন যে এইরূপ কোরবানীর জন্য আপনি সদা-প্রস্তুত?

(৭) আপনার এইরূপ মনোবল আছে কি যে সমস্ত জগৎ বলিবে, 'ভুল'—আর আপনি বলিবেন, 'শুদ্ধ'। চারিদিক হইতে লোকেরা হাট্টি করিবে, কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখিবেন। লোক আপনার পশ্চাৎধাবন করিয়া বলিবে: দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করিব'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুতধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়াইয়া পড়িবে এবং আপনি মাথা পাতিয়া বলিবেন: 'এসো, প্রহার কর।' আপনি তাহাদের কাহারও কথা মানিবেন না, কেননা তাহারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করিতে বাধ্য করিবেন, কেননা আপনি সত্যবাদী।

(৮) আপনি এই কথা বলেন না যে, আপনি পরিশ্রম করিয়াছেন, কিন্তু খোদাতায়ালা আপনাকে অকৃতকার্য করিয়াছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজেরই দোষের ফলশ্রুতি বলিয়া মনে করেন। আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, যে পরিশ্রম করে সেই কৃতকার্য হয়, যে কৃতকার্য হয়; নাই সে আদৌ পরিশ্রম করে নাই।

আপনি যদি এইরূপ হইয়া থাকেন তাহা হইলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী।

কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার এক বান্দা অনেকদিন হইতে আপনার অনুসন্ধান করিতেছেন। হে আহ্‌মদী যুবক! সেই ব্যক্তির অনুসন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে; অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হইতে চলিয়াছে; রক্ত সিঞ্চনে উহা পুণরায় সজীব হইবে। ['খালেদ', ডিসেম্বর, ১৯৬৪ইং]

ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব
এবং
হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর গুরুত্ব

—মোঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী।

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ বর্ষের আগমন মুসলিম বিশ্বে আত্মচেতনার শুভ সঞ্চার ঘটাইয়াছে। আল-হামদু লিল্লাহ্।

কোন সন্দেহ নাই যে চতুর্দশ শতাব্দী ইসলামের ইতিহাসে এই হিসাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ শতাব্দী যে, সারা মুসলিম উম্মত এই শতাব্দীর প্রারম্ভকালে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষমান ছিল। সেই শতাব্দীর এখন শেষ পর্ব। সুতরাং উক্ত বিষয়টি বিশেষভাবে তলাইয়া দেখা সকলের একান্ত কর্তব্য।

কুরআন ও হাদিস মূলে ইহা সর্বস্বীকৃত যে, আল্লাহ্‌তায়ালার শ্রেষ্ঠতম রসুল খাতামান-নবীয়ীন হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহুঃ) আখেরী জামানায় ইসলামের চরম অধঃপতিত ও বিপদ-সঙ্কুল যুগে ইসলামের পুনরুজ্জীবন এবং সকল ধর্ম ও মতবাদের উপর উহার বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাঁহার অন্যতম বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক সন্তান আল্লাহ্‌র মনোনীত মহাপুরুষ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাব সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ সুসংবাদ রাখিয়া গিয়াছেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা সুরা আল-সাফের ১ম রুকুতে বলিয়াছেন:

هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله

(অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌তায়ালাই তাঁহার রসুলকে পূর্ণ হেদায়েত এবং সত্য দ্বীন সহকারে অপর সকল দ্বীন ও মতবাদের উপর উহাকে জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছেন।")

উক্ত আয়াত সম্বন্ধে শিয়া ও সুন্নি উভয় সম্প্রদায়ের ইমাম ও বিশিষ্ট আলেমগণ সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতে ঘোষিত ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের ওয়াদা প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহ্‌দীর আবির্ভাবের দ্বারা পূর্ণ হইবে।

সুতরাং ইমাম ইবনে জরীর (রঃ) উক্ত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন:

و ذالك عند نزول عيسى ابن مريم

অর্থাৎ—"সকল ধর্মের উপর ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার প্রতিশ্রুত মসীহ ঈসা ইবনে মরিয়মের আবির্ভাবকালে সংঘটিত হইবে।" (তফসীর ইবনে জরীর, পৃঃ ১৫৪ এবং তফসীর জামেউল বাইয়ান, পৃঃ ২৯)। তেমনিভাবে শিয়া প্রামাণিক গ্রন্থাবলীতে লিখিত আছে:

انها نزلت فى القائم من ال محمد و هو الامام الذى يظهره الله على الدين كله

অর্থাৎ—"এ আয়াত 'কায়েম আলে মুহাম্মদ' তথা মাহ্দী সম্পর্কে নাযেল হইয়াছে এবং তিনিই সেই ইমাম যাঁহাকে আল্লাহ্তায়ালা সকল ধর্মের উপর প্রাধান্য দান করিবেন।"

(বেহারুল আনওয়ার, ১৩ খণ্ড ১২ পৃঃ এবং তফসীর সাফী, কুম্মীর বরাতে)।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত ইমাম মাহ্দীর সম্বন্ধে এক হাদিসে হযরত নবী করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন :

يهلك الله فى زمنه كل الملل الا الاسلام (مسلم)

অর্থাৎ—"ইমাম মাহ্দীর সময়েই আল্লাহ্তায়ালা ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্ম ও মতবাদকে নির্মূল করিয়া দিবেন।"

হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনায় এই একই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষকে কখনও মসীহ ইবনে মরিয়ম এবং কখনও আল-ইমামুল-মাহ্দী নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে ; বস্তুতঃ হাদিসের সুস্পষ্ট বর্ণনায় একজন ব্যক্তিরই দুইটি উপাধি বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ) বলিয়াছেন :

يوشك من عاش منكم ان يلقى ابن مريم اماما مهديا

অর্থাৎ—"তোমাদের মধ্যে যাহারা জীবিত থাকিবে তাহারা অচিরেই ইবনে মরিয়মকে ইমাম মাহ্দীরূপে পাইবে।" (মুসনদ আহমদ, ২য় খণ্ড, মিশরে মুদ্রিত, পৃঃ ৪১১)।

তেমনিভাবে ইবনে মাজা, হাকিম, কানযুল উম্মাল ও তারিখুল খুলাফা গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত এক হাদিসে দ্ব্যর্থহীণ ভাষায় বলা হইয়াছে যে,

و لا المهدى الا عيسى

অর্থাৎ—'ঈসা ব্যতীত অন্য কেহ মাহ্দী নাই।"

মোট কথা, মসীহ ও মাহ্দী অর্থাৎ হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) সম্বন্ধে হযরত নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহুঃ) সুনিশ্চিত এবং সুনির্দিষ্ট সংবাদ দিয়াছেন এবং আদেশ করিয়াছেন :

فاذا رأ يتموه فبايعوه و لو حبوا على الثلج فانه خليفة الله المهدى

"যখনই তোমরা তাঁহার আবির্ভাব ঘটিতে দেখিবে, তখনই তোমরা তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার হস্তে বয়াত গ্রহণ করিবে, যদিও তোমাদিগকে বরফের পাহাড়ের উপর হামাগুড়ি দিয়া পৌঁছিতে হয়। নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্র খলিফা—মাহ্দী।" (সোনান ইবনে মাজা, পৃঃ ৩১ এবং অবু দাউদ)। এবং আরও বলিয়াছেন যে,

و يؤمن به من ادركه منكم فليقرأ به منى السلام

"তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইমাম মাহ্দীকে পাইবে, তাঁহার উপর ঈমান আনিবে এবং তাহাকে আমার সালাম বলিবে।" (কানযুল উম্মাল এবং বেহারুন আনওয়ার)

আজ হইতে নব্বই বৎসর পূর্বে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে, ১৩০৬ সনে, হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আলাইহেস্সালাম) আল্লাহ্র প্রত্যাদেশমূলে দাবী করিয়াছিলেন যে,

তিনিই সেই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী, এবং তিনি হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের দেওয়া সুসংবাদ অনুযায়ী প্রতিশ্রুত নির্দিষ্ট সময়ে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার সম-সাময়িককালে অন্য কেহও ঐ দাবী পেশ করে নাই। তিনি বলিয়াছেন ঃ

ওয়াক্ত্ থা ওয়াক্তে মসীহ্ না কিসি আওর কা ওয়াক্ত্।
ম্যাঁ না আতা তো কোই আওর হি আতা হোতা !! (দুররে সমীন)

তাঁহার সত্যতার সপক্ষে কুরআন মজীদ, হাদিস শরীফ এবং অন্য সকল ধর্মগ্রন্থের আলোকে বিদ্যমান শত শত যুক্তি-প্রমাণ এবং একই রমজান মাসের নির্দিষ্ট তারিখদ্বয়ে চন্দ্র-গ্রহণ ও সূর্য-গ্রহণ সংঘটিত হওয়া সহ সহস্র সহস্র স্বর্গীয় নিদর্শনের মধ্যে একটি প্রকাশ্য নিদর্শন ইহাও যে, সময় ও যুগের অবস্থা তাঁহার আবির্ভাবের সত্যতা সাব্যস্ত করিয়াছে এবং প্রতি দিন উদীয়মান সূর্য এই বিষয়টিকে উজ্জলতর করিয়া চলিয়াছে। আর তাঁহার আগমনে যখন একটি শতাব্দী পূর্ণ হইতে চলিয়াছে তখন ইহার উজ্জলতা প্রবল শক্তিতে প্রমাণ করিতেছে যে, জগতের জন্য এই বাস্তবতাকে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। পবিত্র কুরআন, হাদিস এবং অপরাপর সকল ধর্ম-গ্রন্থের সকল ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই যুগে যে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আবির্ভাব নির্ধারিত ছিল, তিনি হইলেন একমাত্র হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)। নির্ধারিত সময়ে আল্লাহ্তায়ালার প্রত্যাদিষ্ট মসীহ্ ও মাহদী এবং সকল ধর্মের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হিসাবে একমাত্র তিনিই জগতের বুকে দণ্ডায়মান এবং তাঁহার জামাত ঐশী খেলাফতের নেতৃত্বাধীনে অবিচল থাকিয়া যুক্তি-প্রমাণ ও ঐশী নিদর্শনাবলীর দ্বারা ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার রাজপথে ক্রমঅগ্রসরমান।

প্রতিশ্রুত সময় ঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগ ঃ

(১) হযরত মুসা (আঃ)-এর সহিত হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর সাদৃস্য (সুরা আল-মুযাম্মিল, ১ম রুকু) এবং মুসলিম উম্মতের সংস্কারক ও খলিফাগণের পূর্ববর্তী মুসায়ী উম্মতের সংস্কারক ও খলিফাগণের সহিত সুরা নূরের নবম রুকুতে ঘোষিত সাদৃস্যের ওয়াদা অকাট্যরূপে প্রমাণ করিতেছে যে হযরত মুসা (আঃ)-এর উম্মতে তাঁহার পরে চতুর্দশ শতাব্দীর মাথায় যেভাবে মুসায়ী উম্মতের এক ব্যক্তি—হযরত ঈসা ইস্রাইলী-মসীহ্ হিসাবে তওরাত-শরীয়তের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও ইহুদীদের সংস্কারের উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন, তেমনিভাবে হযরত নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর উম্মতে তাঁহার পর চতুর্দশ শতাব্দীর মাথায় এই উম্মতেরই এক ব্যক্তি মুহাম্মদী-মসীহ্ ইমাম মাহদী রূপে কুরআনী শরীয়তের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে আগমন করিবেন। সুতরাং কুরআন করীম অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসীহ্র আগমন-কাল চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগ।

[প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে প্রায় ১৯ শত বৎসর পূর্বে ইস্রাইলী নবী হযরত ঈসা (আঃ) পবিত্র কুরআন, হাদিস, ইসলামের বহু ইমামের উক্তি, বাইবেল এবং ঐতিহাসিক রেকর্ড-পত্রের অকাট্য

যুক্তি-প্রমাণের মূলে অন্যান্য সকল মানব এবং নবীগণের ন্যায় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন—তিনি ক্রুশেও মারা যান নাই এবং আকাশেও উত্তোলিত হন নাই। (বিস্তারিত যুক্তি-প্রমাণ জানার জন্য ওফাতে ঈসা ইত্যাদি পুস্তক দ্রষ্টব্য]। পাক-ভারত উপমহাদেশ হইতে লইয়া মিশর (আজহার ইউনিভার্সিটি) এবং আফ্রিকা পর্যন্ত বিশিষ্ট আলেম ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ উক্ত প্রমাণিত সত্যটি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং অন্যান্যরাও ক্রমশঃ স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইতেছেন। 'ঈসা ইবনে মরিয়মের আখেরী যুগে নযুল' বলিতে হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর একজন পূর্ণ অনুসারী ব্যক্তির ঈসা (আঃ)-এর গুণসম্পন্ন এবং তাঁহার 'মসীল' (সদৃশ) হিসাবে আগমনকে বুঝায়। ইহাই স্বতঃসিদ্ধ, স্বীকৃত সত্য। আল্লাহতায়ালা যাহাদিগকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়া ইহা বুঝিবার তওফিক দেন, তাহারা প্রশংসার যোগ্য।]

(২) আল্লাহতায়ালা সূরা সিজদার প্রথম রুকুতে বলিয়াছেন :

يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره
الف سنة مما تعدون ○

অর্থাৎ—"আল্লাহ আকাশ হইতে পৃথিবীতে কুরআনী শরীয়তের সুপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিবেন। পুনঃ কিছু কাল পর উহা তাঁহার দিকে উঠিয়া যাইবে এক দিনে, যাহা তোমাদের গণনায় এক হাজার বৎসর।"

সহী বোখারী, মসলিম, নেসায়ী এবং মেশকাত ৫৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হাদিসে হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ) বলিয়াছেন :

خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب-

অর্থাৎ—"আমার শতাব্দী সর্বোৎকৃষ্ট শতাব্দী, তারপর উহার সন্নিহিতগণের শতাব্দী, তারপর উহার সন্নিহিতগণের শতাব্দী। অতঃপর মিথ্যা ছড়াইয়া পড়িবে।"

উক্ত হাদীসে বর্ণিত কুরআন প্রতিষ্ঠার প্রথম উৎকৃষ্ট শতাব্দীত্রয় অতিবাহিত হইলে ثم يعرج اليه ('তারপর উহা উঠিয়া যাইতে থাকিবে')—আয়াতাংশ সম্পর্কিত এক হাজার বৎসর-কালের যুগ শুরু হয়। ইহাকে অন্যান্য হাদীসে فيج اعوج বা 'বক্র যুগ' বলিয়াও আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সেই যুগে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী দ্বীনে-ইসলামের সুপ্রভাব মানবহৃদয় হইতে ক্রমশঃ উঠিয়া যায় এবং ঈমান ধরা-পৃষ্ঠ হইতে সুরাইয়া নক্ষত্রে চলিয়া যায় (বুখারী শরীফ)। সুতরাং ইসলামের প্রথম উৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীকে উল্লিখিত এক হাজার বৎসর কালের বক্র যুগের সহিত যোগ করিলে (৩০০+১০০০=১৩০০) তের শত বৎসর দাঁড়ায়। ইহাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে চতুর্দশ শতাব্দীর মাথায় বা প্রারম্ভেই ঈমানকে পুনরায় ধরাপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠাকারী প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব নির্ধারিত ছিল। সুতরাং সূরা জুমার প্রথম রুকুতে و اخرين منهم لما يلحقوا بهم

(অর্থাৎ, "হযরত নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহুঃ) পরবর্তীদের মধ্যে পুনঃ আবির্ভূত হইয়া কুরআন শিক্ষা দিবেন।")—আয়াতের ব্যাখ্যা স্বয়ং নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ) বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদিসে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন :

لو كان الايمان معلقا بالثريا لنا له رجل من هؤلاء

অর্থাৎ—"পারশ্য বংশীয় এক ব্যক্তি সপ্তর্ষিমণ্ডলে চলিয়া যাওয়া ঈমান ধরা-পৃষ্ঠে নামাইয়া আনিবেন।" (বুখারী—কেতাবুত-তফসীর)।

এই মহাপুরুষের আগমনকেই উক্ত হাদিসে হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ) সুরা জুমার ১ম রুকুতে বর্ণিত তাঁহার 'দ্বিতীয় আগমন' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং অপরাপর হাদিসে তাহাকে ইমাম মাহ্দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, যাহার আবির্ভাবের নির্দিষ্ট যুগ উল্লেখিত কুরআনী যুক্তি-প্রমাণে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগ বা প্রারম্ভ কাল বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।

হাদিস শরীফ এবং বুজুর্গানে উম্মতের অভিমতের আলোকে প্রতিশ্রুত সময় :

হিজরী সনের বারটি শতাব্দী অতিক্রম করিলে মুসলিম উম্মত পবিত্র কুরআন ও হদিস এবং উম্মতের বিশিষ্ট অলী ও বুজুর্গানের উক্তি ও অভিমত মূলে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আবির্ভাবের জন্য অধীরচিত্তে অপেক্ষমান ছিল এবং যতই সময় পার হইতেছিল, ততই সেই প্রতীক্ষা তীব্র হইয়া উঠিতেছিল। কেননা ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আগমন সম্পর্কে কুরআন শরীফের তফসীর, হাদীস গ্রন্থাবলী এবং আকায়েদ ও ফেকাহ্ সংক্রান্ত ইমাম ও বুজুর্গাণের গ্রন্থাবলীতে যে নির্দিষ্ট যুগ ও সময়ের পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল তাহা ঘনাইয়া আসিয়াছিল।

(১) মেশকাত শরীফে হাদিস বর্ণিত হইয়াছে :

عن قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايات بعد المائتين

অর্থাৎ আবু কাতাদা বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত রসুল করীম (সাল্লাল্লাহুঃ) বলিয়াছেন, "ইমাম মাহ্দী সংক্রান্ত লক্ষণাবলী 'দুইশত বৎসর' পরে দেখা দিবে।"

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত আহ্লে-সুন্নত ইমাম হযরত মুল্লা আলী কারী (রহঃ) বলিয়াছেন :

يحتمل ان يكون الام في المائتين بعد الالف وهو الوقت لظهور المهدى

অর্থাৎ—"মাহ্দী সম্পর্কিত লক্ষণসমূহ দুই শত বৎসর পর প্রকাশিত হইবে"—হাদিসটির অর্থ এই বুঝায় যে, নবী করীম (সাঃ)-এর হিজরতের এক হাজার বৎসর অতিক্রম হওয়ার পর আরও দুইশত বৎসর অতিবাহিত হইবে অর্থাৎ বার শত বৎসর পর নির্দিষ্ট লক্ষণ সমূহ প্রকাশ হইবে এবং উহাই ইমাম মাহ্দীর যাহির হওয়ার সময়।"

[মেরকাত, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৮৫ এবং মিশকাত, পৃঃ ২৭১]

(২) হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর আর একটি হাদিস আছে যাহা 'আল-নাজমুস-সাকেব' গ্রন্থে আল্লামা আব্দুল গফুর (রহঃ) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :

عن حذيفة ابن يمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اذا مضت الف و مائتان واربعون سنة يبعث الله المهدى"

অর্থাৎ—হযরত হুজায়ফা বিন ইয়ামান হইতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহুঃ) বলিয়াছেন যে, "যখন ১২৪০ বৎসর (বাদ হিজরত) অতিক্রান্ত হইবে, তখন আল্লাহ্তায়ালা ইমাম মাহ্দীকে পাঠাইবেন।" (আল-নাজমুস সাকেব, ২য় খণ্ড, ২০৯ পৃঃ)

(৩) উম্মতে মুজাদ্দিদগণের আগমন সংক্রান্ত হাদিসে হযরত নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহুঃ) বলিয়াছেন যে প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে আল্লাহ্তায়ালা এই উম্মতের মধ্যে তাহাদের ধর্মের গ্লানি দুর করার উদ্দেশ্যে মুজাদ্দিদগণকে পাঠাইতে থাকিবেন।" (আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১২)

(৪) হিজরী ১২৯১ সালে প্রকাশিত 'হুজাজুল কেরামাহ' প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তের শতাব্দী ব্যাপী মুজাদ্দিদগণের একটি তালিকা প্রদানের পর লিপিবদ্ধ আছে যে,

و بر سر مائة چهاردهم كه ده سال كامل اندرا باقى است اگر ظهور مهدى عليه السلام و نزول عيسى صورت گرفت پس ايشان مجدد و مجتهد باشند -

অর্থাৎ—"চতুর্দশ শতাব্দী আরম্ভ হওয়ার পথে পূর্ণ দশ বৎসর কাল অবশিষ্ট আছে। যদি মাহ্দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ ইতিমধ্যে যাহির হন, তাহা হইলে তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ও মুজতাহিদ হইবেন।" (হুজাজুল কেরামাহ্, পৃঃ ১৩৯)

তিনি উক্ত গ্রন্থের ৩৭৫ পৃষ্ঠায় আরও লিখেন :—

'আলেম ও অলি-আল্লাগণের ঐক্যমত যে ইমাম মাহ্দী হিজরী ত্রয়দশ শতাব্দী অতিক্রম হইবার পূর্বেই আবির্ভূত হইবেন।"

"জানা উচিত যে, চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাব হইবে।"

(৫) দ্বাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ও মুসলিম রেনেসাঁর অগ্রনায়ক হযরত ওলিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) তাঁহার প্রণীত 'তাফহীমাতে রব্বানীয়া' গ্রন্থের ২য় খণ্ড ১২৩ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, "আমাকে আমার রব আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু জানাইয়াছেন যে, ইমাম মাহ্দী আবির্ভূত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।" তেমনিভাবে "আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাকে আরও জানাইয়াছেন যে, ইমাম মাহ্দী হিজরী ১২৬৮-এর পর আবির্ভূত হইবেন।" (হুজাজুল কেরামাহ ; পৃষ্ঠা ৩৭৪)

(৬) হযরত শাহ্ আব্দুল আজিজ (রহঃ) তাঁহার রচিত "তোহফা ইসনা আশারীয়া" গ্রন্থে এবং হযরত ইসমাইল শহীদ (রহঃ) 'আরবাইন' গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

"ত্রয়দশ শতাব্দীর পরে পরেই ইমাম মাহ্দীর আগমনের অপেক্ষা করা উচিৎ।"

৭) প্রায় আট শত বৎসর পূর্বে একজন সাহেবে-কাশ্‌ফ বুজুর্গ হযরত নে'মাতুল্লাহ্ ওলী (রহ্ঃ) তাঁহার প্রসিদ্ধ ফারসী কসীদায় আখেরী যুগের ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়া "গাফ-রে" অর্থাৎ হিজরী বার শতাব্দীর পর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ

مهدی و عیسی دوران هر دو را شهسوار می بینم

অর্থাৎ— "সেই সময়ে মাহ্‌দী ও ঈসাকে আমি এক অশ্বারহী রূপে দেখিতে পাইতেছি।'

['আরবাইন ফি আহওয়ালেল মেহ্‌দিয়ীন'—হিঃ ১২৬৮ সালে হযরত ইসমাইল শহীদ প্রণীত গ্রন্থে সন্নিবেশিত উক্ত কসীদার প্রামাণ্য ভাষ্য, 'মকতাবা পাকিস্তান' কর্তৃক প্রকাশিত]।

(৮) হযরত মহিউদ্দীন ইবনে আরবী (হিঃ ৬২৮ সালে মৃত্যু) তাঁহার প্রণীত 'ফসুসুল হিকাম' গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ و یکون ظهوره بعد مضی خ ف ج بعد الهجرة

অর্থাৎ— "ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব হিজরতের পর 'খে, ফে জিম' অতিক্রম হইলে সংঘটিত হইবে, অর্থাৎ, 'হিজরত' শব্দের আবজাদ শাস্ত্রের হিসাবে মূল্যায়ন দাঁড়ায় ৬০৮ এবং খে, ফে, জিম-এর পরিমাণ ৬৮৩ হয়। এমতে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাব ৬০৮+৬৮৩=হিঃ ১২৯১ সনে সংঘটিত হইবে।" (মুবাদ্দামা ইবনে খলদুন, পৃঃ ২৬৪—মৌলানা সাইদ হাসান, ফাজেলে-ইলাহিয়াত কর্তৃক 'আহ্‌সানুল-মোতাবেয়ে' (করাচী) মুদ্রণালয়ে প্রকাশিত)।

তেমনিভাবে মুজাদ্দিদ আলফে-সানী হযরত আহমদ সারহেন্দি (রহঃ), হযরত আল্লামা আল-শা'রানী (হিঃ ৯৭৬ মৃত্যু) এবং আরও অসংখ্য বিশিষ্ট আলেম এবং অলি আল্লাগণ পবিত্র কুরআন ও হাদিস এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত স্বীয় জ্ঞান ও ইলহাম মূলে সর্ববাদি সম্মতরূপে বলিয়া গিয়াছেন যে, ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব হইবে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে।

(৯) আল্লামা নবাব আবুল খাইর নূরুল হাসান খান হিঃ ১৩০১ সনে তদীয় গ্রন্থ 'ইক্‌তেরাবুস্‌-সায়া' ২২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলেন ঃ

"এ হিসাবেই মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাব ত্রয়দশ শতকে হওয়া উচিত ছিল কিন্তু উক্ত শতক যদিও সম্পূর্ণ অতিবাহিত হইল, তবুও মাহ্‌দী আবির্ভূত হইলেন না। এখন চতুর্দশ শতাব্দী আমাদের মাথায় উপস্থিত। এই শতাব্দী হইতে অত্র পুস্তক লেখা পর্যন্ত ছয় মাস অতিক্রান্ত হইয়াছে। হয়ত আল্লাহ্‌তায়ালা আপন ফজল ও আদল, এবং রহম ও করম বর্ষণ করিবেন, চার ছয় বৎসরের মধ্যেই মাহ্‌দী (আঃ) আবির্ভূত হইয়া যাইবেন।"

"এখন হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শুভ সূচনা ঘটিয়া গিয়াছে, চতুর্দিকে আচ্ছন্ন ফেৎনা-ফসাদ ও বিশৃঙ্খলার দুঃসংবাদে কান ভরিয়া গিয়াছে। অপেক্ষা করুন, আর দেখুন, পরিণামে কি ঘটে, আমাদের ক্ষুৎ-পিপাসা ক্লিষ্ট অবস্থা কি রং ও রূপ পরিগ্রহ করে।" (ঐ পৃঃ ২২১)

বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তায়ালা এক মুহূর্তের জন্যও তাঁহার অনড়-অটল প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিতে বিলম্ব হইতে দেন নাই। তিনি হিঃ ১৩০৬ সনে অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও জ্বলন্ত নিদর্শনাবলী সহকারে প্রতিশ্রুত মসিহ্ ও মাহ্‌দীর মহান দাবীর সহিত খাড়া করেন। 'যালিকা ফজলুল্লাহে ইউতিহে মাইয়াশায়ু ওয়া হুয়াল আযীযুল হাকীম'—'ইহা আল্লাহ্‌র মহান করুণা, যাহা তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকেই দান করেন ; তিনি প্রবল ও প্রজ্ঞাময়'—(সুরা জুমা ঃ ৫)।

চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ এবং ইমাম মাহ্‌দী হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) বলেন : "মুসলমানগণের মধ্যে এক হাজারেরও অধিক সংখ্যক সাহেবে-কাশ্‌ফ বুজর্গান তাঁহাদের কাশফ ও দিব্যজ্ঞানের মূলে এবং খোদাতায়ালার কালামের দ্বারা বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক সর্ববাদিসম্মতক্রমে বলিয়া গিয়াছেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহ্‌দীর আবির্ভাব চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগকে কখনও এবং কোন অবস্থাতেই অতিক্রম করিবে না। আহলে-কাশ্‌ফ (দিব্যজ্ঞানের অধিকারী) ওলি-আল্লাগণের এরূপ এক বিপুল সংখ্যক দল, যাঁহাদের মধ্যে পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণও শামিল —তাঁহারা সকলেই কি মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হইতে পারেন? তাহাদের সকল বিচার-বিশ্লেষণ কি মিথ্যা সাব্যস্ত হইতে পারে? তাহা কখনও সম্ভব নয়।"

(তেহ্‌ফায়ে গোলড়াভিয়া, পৃঃ ১৩৪)

"আকাশ হইতে প্রতিশ্রুত মসিহ্‌র অবতরণ শুধু একটি মিথ্যা ধারণা। স্মরণ রাখিবেন, কেহ আকাশ হইতে অবতরণ করিবে না। আমাদের যত সব বিরুদ্ধবাদী এখন জীবিত আছেন তাহারা সকলই পরলোক গমন করিবেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহই মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ)-কে আকাশ হইতে নামিতে দেখিবেন না। তারপর তাঁহাদের সন্তানগণের মধ্যে যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে, তাঁহারাও মরিবে এবং তাহাদেরও কোন ব্যক্তি মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ)-কে আকাশ হইতে অবতরণ করিতে দেখিবে না। তারপর তাহাদের সন্তানরাও মরিবে। তাহারাও মরিয়ম পুত্রকে আকাশ আকাশ হইতে নামিতে দেখিবে না। তখন তাহাদের হৃদয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইবে—"ক্রুশ প্রাধান্যের সময়ও উত্তীর্ণ হইয়াছে,—বিশ্ব-পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটিয়াছে কিন্তু মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) আজও আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন না?" তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সমবেতভাবে এই বিশ্বাসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িবেন এবং আজিকার দিন হইতে তৃতীয় শতাব্দী পার হইবে না, যখন ঈসা নবী (আঃ)-এর অপেক্ষারত, কি মুসলমান কি খ্রীষ্টান, সম্পূর্ণ নিরাশ ও হতাস হইয়া আকাশ হইতে অবতরণের) এই মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করিবে এবং পৃথিবীতে তখন একই ধর্ম (ইসলাম) ও একই ধর্মনেতা (সাঃ) হইবেন। আমি কেবল বীজ বপন করিতে আসিয়াছি। অতএব আমার দ্বারা বীজ বপিত হইয়াছে, এখন ইহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং ফল-ফুলে সুশোভিত হইবে। কেহ ইহাকে রোধ করিতে সক্ষম হইবে না।" (তাযকেরাতুশ-শাহাদাতাইন, পৃঃ ৬৫ সন ১৯০৩ইং)

"কিয়ামতকাল পর্যন্ত ঐরূপ কোন মাহ্‌দীও আসিবে না ·····এবং এরূপ কোন মসীহও আসিবে না যে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয়। এমনতর উভয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আশা ছাড়িয়া দিন। এ সবই আক্ষেপপূর্ণ অলীক নিরাশা, যেগুলি এই যুগের ঐ সকল মানুষকে কবরে লইয়া যাইবে। কোন মসীহ অবতীর্ণ হইবে না এবং কোন খুনী (রক্তপাতকারী) মাহ্‌দীও আবির্ভূত হইবে না। যে ব্যক্তির আগমন নির্ধারিত ছিল তিনি আসিয়া গিয়াছেন।"

('তবলীগে রেসালত', দশম খণ্ড, পৃঃ ৮৭০)

"খোদাতায়ালার পবিত্র বাণীর দ্বারা আমাকে জ্ঞাত করা হইয়াছে যে, আমি তাঁহার তরফ হইতে প্রত্যাদিষ্ট 'প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী এবং ভিতরের ও বাহিরের সকল বিভেদ ও মতানক্যের ন্যায়মীংসাকারী।" (আবরাইন, পৃঃ)

"প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ (ও মাহ্‌দী) আসিয়া গিয়াছেন এবং সে ব্যক্তি আমিই।"

(মলফুজাত ২য় খণ্ড পৃঃ ২৮৫

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার শ্রদ্ধেয় আমীর সাহেবগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

		এমারত কাল
১।	মোহ্তারম মৌঃ সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব (রহঃ)	১৯১৪—১৯২৬ ইং
২।	মোহ্তারম প্রফেসার আব্দুল লতিফ সাহেব (রহঃ)	১৯২৬—১৯৩০ ,,
৩।	মোহ্তারম মাহমুদ আহমদ হেকীম আবু তাহের সাহেব (রহঃ)	১৯৩০—১৯৩৫ ,,
৪।	মোহ্তারম খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী সাহেব (রহঃ	১৯৩৫—১৯৪২ ,,
৫।	মোহ্তারম খান সাহেব মৌঃ মোবারক আলী সাহেব (রহঃ)	১৯৪২--১৯৪৯ ,,
৬।	মোহ্তারম মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব	১৯৪৯—১৯৫৫ ,,
৭।	ক্যাপ্টেন চৌধুরী খুরশীদ আহমদ সাহেব	১৯৫৫—১৯৫৭ ,,
৮।	মোহ্তারম শেখ মাহমুদুল হাসান সাহেব	১৯৫৭—১৯৬২ ,,
৯।	মোহ্তারম মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব	১৯৬২ ইং সন হইতে বর্তমান কাল।

শ্রদ্ধেয় আমীর সাহেবানের মধ্যে কয়েকজন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে দেওয়া হইল।

মৌলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব (রহঃ)

তিনি বৃটিশ শাসন কালে বঙ্গদেশের আহমদীয়া জামাতের সর্বপ্রথম আমীর ছিলেন। তিনি ১৮৫৩ইং সালে কুমিল্লা জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণ বাড়ীয়ার নাছিরপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত সৈয়দ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা এবং লক্ষ্ণৌতে শিক্ষা লাভ করেন। পরে তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অন্নদা হাই স্কুলের হেড মৌলভী এবং জামে মসজিদের ইমামের পদ গ্রহণ করেন। এই অঞ্চলে তাঁহার লক্ষাধিক মুরিদ ছিল। এতদ্ব্যাতীত তিনি 'কাজী' পদেও নিয়োজিত ছিলেন।

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর দাবীর সংবাদ তিনি ১৯০৭ সনে সর্বপ্রথম পান। তিনি দাবীকারকের পুস্তকাদি পাঠ

লণ্ডনে অনুষ্ঠিত "Delivarence of Jesus from the Cross" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছেন হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) [জুন ১৯৭৮ইং]

চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরউল্লা খান
উপরোক্ত সম্মেলনে যোগদানের জন্য যাচ্ছেন

করিতে থাকেন এবং তাঁহার সংগে পত্রালাপও করেন। তাঁহার কোন কোন পত্র হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তদীয় গ্রন্থ বারাহীনে আহমদীয়ার ৫ম খণ্ডে উদ্ধৃত করিয়া তাহার কতক প্রশ্নের বিশদ উত্তর দান করেন। ১৯১২ সালে তিনি স্বয়ং কাদিয়ানে স্থান এবং আহমদীয়াত সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয়ে অবগত হইয়া বয়েত গ্রহণ করেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা)-এর হাতে। অতঃপর বঙ্গীয় আহমদীয়া জামাতের সর্ব প্রথম আমীর এবং মুবাল্লিগ হিসাবে তাঁহাকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ) নিযুক্ত করেন। ১৯২৬ সালের ১৮ই মার্চ তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁহার লিখিত "জাজবাতুল হক" "হেদায়েতুল মাহ্দী" ইত্যাদি পুস্তক সত্য সন্ধানীদের জন্য অতি মূল্যবান গ্রন্থ।

প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেব (রহঃ)

মরহুম অধ্যাপক আব্দুল লতিফ সাহেব ১৮৮০ খৃঃ ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। বয়োপ্রাপ্তির বহু পূর্বেই তিনি পিতার স্বযত্ন তত্ত্বাবধান থেকে বঞ্চিত হন। তাঁহার মামা তাঁহাকে লালন পালনের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ধর্ম বিষয়ে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে মাদ্রাসায় প্রেরণ করেন। তাঁহার অধ্যবসায় ও পরিশ্রমী স্বভাবের ফলে শীঘ্রই তিনি শিক্ষকদের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন এবং শেষ পর্যন্ত ঢাকা হইতে মাদ্রাসা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর তিনি ইসলামীয়া ইংরাজী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তথা হইতে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি ধর্মীয় বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় চলিয়া আসেন। এখানে তিনি আরও চার বৎসরকাল অধ্যয়ন করেন এবং টাইটেল কোর্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবর্তীন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং তাঁহার এই অসাধারণ সফলতার স্বীকৃতি স্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। কলিকাতায় তিনি রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির সহিত যুক্তভাবে কাজ করেন এবং ইসলামিক দর্শন সম্বন্ধনীয় রচনাবলী প্রণয়ন করেন। এরই মধ্যে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে ইংরাজীতে উচ্চ শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করেন।

وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ

"যখন উষ্ট্র বেকার হইবে"

আল কোরআন

আখেরী জমানার চিহ্ন

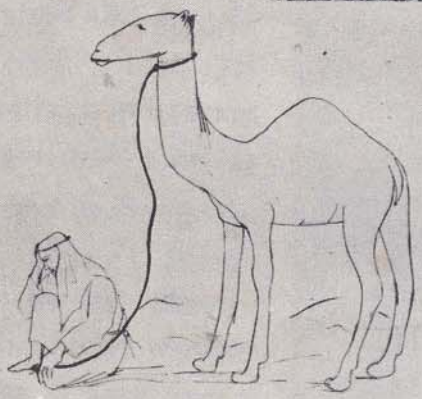

হযরত রসুল করিম (সাঃ) বলিয়াছেন

'উট বেকার হইবে,

উহাতে চড়িয়া (কেহ) দূর দেশে যাইবেনা।'

আল হাদিস

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী আখেরী জামানার কয়েকটি চিহ্ন

১৯০৮ সালে তিনি চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে আরবী এবং ফার্সী ভাষার লেকচারার নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি তাঁহার গভীর জ্ঞানের অনুশীলন ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য ছাত্র ও সহ-কর্মীদের হৃদয় জয় করিয়া ফেলেন। যাহারা কোন দিন তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহার মহান ব্যক্তিত্ব ও চমৎকার নৈতিকতাবোধ তাহাদের মনকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ১৯৩১ সালের শেষ প্রান্তে মৃত্যুর সু-শীতল হাতের স্পর্শে পার্থিব জগত ছেড়ে যাওয়ার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত তিনি ছিলেন কলেজ ম্যাগাজিনের নিয়মিত লেখক এবং বিভিন্ন ধর্মের সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট বক্তা।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে আরবী শিক্ষার তেমন প্রসারতা ছিল না। ফলে বঙ্গদেশে স্বভাবতঃই এ্যাংলো-আরবী ভাষার পাঠ্য বইয়ের অভাব দেখা দিয়াছিল। বহু দিন হইতে অনুভূত এই অভাব তাঁহার দুইটি মূল্যবান সৃষ্টি—"এ্যাংলো-এরাবীক প্রাইমার" এবং "Elementary Anglo-Arabic Grammar" দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে এবং বঙ্গ দেশের উচ্চ বিদ্যালয় গুলিতে আরবী শিক্ষার এক নূতন দিগন্তের সৃষ্টি হইয়াছিল।

বিশেষভাবে মুসলমানদের জন্য এ্যাংলো-আরবী সাহিত্যের উন্নতি কল্পে তিনি যখন ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, তখনই কাদিয়ান থেকে হযরত আহমদ (আঃ)-এর একটি বার্তায় তিনি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং যুগ-ইমামের দ্বারা ব্যাখ্যাকৃত পবিত্র কোরআনের শিক্ষাদানের ফলে তাঁহার দার্শনিক মন পবিত্র কুরআনে প্রাণের স্পর্শ পাইল।

অতঃপর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি জামাতে আহ্‌মদীয়ার সদস্য হিসাবে বয়েত গ্রহণ করেন। এই সংবাদ ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহার অধিকাংশ বন্ধু-বান্ধব এবং সুহৃদ তাঁহার এই কার্য্যের বিপক্ষে চলিয়া গেল, তাহারা তাঁহাকে ঘৃণার চোখে দেখিতে লাগিল এবং গোঁড়া আলেম শ্রেণী তাঁহার বিরুদ্ধবাদীর মনে আরো তিক্ততার সৃষ্টি করিল। ফলে তাঁহাকে তাহারা বর্জন করিল, যাহা খোদা প্রেরিত নবীর অনুগামীগণের ক্ষেত্রে সব সময়ই হইয়াছিল। অত্যন্ত নির্যাতন ভোগের পরও শক্তভাবে তিনি সব মোকাবেলা করিলেন এবং যে আলো তিনি কাদিয়ান থেকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার প্রচার কল্পে তাঁহার সমস্ত সাধনা নিয়োজিত করিলেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি "বঙ্গদেশীয় প্রাদেশিক আহমদীয়া আঞ্জুমানের" প্রধান সচীব নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম আমীরের মৃত্যুর পর তিনি আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ের পবিত্র দ্বিতীয় খলিফা কর্তৃক বঙ্গদেশীয় প্রাদেশিক আহমদী সম্প্রদায়ের আমীর নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

* * *

খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী সাহেব (রহঃ)

তিনি ১৮৮৩ইং সনে নাটোরে প্রসিদ্ধ জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবনে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যায়ন করেন এবং ইংরেজীতে এম,এ, পাশ করেন। তিনি পরে বি-টি পাশ করিয়া শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় প্রতিভা এবং কর্ম-দক্ষতা বলে Bengal Senior Education Service-এর সদস্য হিসাবে Divisional Incpector of Schools এবং অতিরিক্ত D. P. I. হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। বৃটিশ সরকার ১৯৩২ সালে তাঁহাকে 'খান বাহাদুর' উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন।

১৯১৬ সালে তিনি আহমদীয়া জামাতে বয়েত গ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালে সমুদ্র পথে কাবা শরীফ হজ্ব পালন করেন। ১৯৩৫ সাল হইতে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর ছিলেন। তিনি কাদিয়ানে হিজরত করেন এবং সেখানে কেন্দ্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যের সংগে জড়িত ছিলেন। তিনি পবিত্র কুরআনের 'তফসিরে কবীর''-এর ইংরেজী অনুবাদ কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন। এছাড়া আরো কয়েকখানি পুস্তক উর্দু হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া জামাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খেদমতের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। তিনি ১৭ই জুন ১৯৪৬ সালে কাদিয়ানে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন এবং বেহেস্তী মোকবরায় সমাহিত হন। মোহতরম খান বাহাদুর সাহেব উৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ সাহেব তাঁহার 'বাতায়ন'' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন: "নিতান্ত ভাল মানুষ ছিলেন এই চৌধুরী সাহেব; ধর্মোৎসাহ ছিল তাঁর অফুরন্ত, অন্তরের নির্মলতা দীপ্তি লাভ করেছিল তাঁর সুন্দর চেহারায়।

খান সাহেব মৌঃ মোবারক আলী সাহেব (রাঃ)

তিনি ১৮৮২ সালে বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৫ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি, এ, পাশ করেন। ১৯০৯ সালে কাদীয়ানে খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রাঃ) এর পবিত্র হস্তে বয়েত গ্রহণ করেন। ১৯১০ সালে বি,টি. পাশ করেন এবং ১৯১৫ সালে চট্টগ্রাম মুসলিম হাই স্কুলের হেড মাষ্টার পদে উন্নতি লাভ করেন। ১৯২০ সালে জার্মানীর বার্লিনে মুবাল্লিগ হিসাবে তাঁহাকে হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) নিযুক্ত করেন। প্রথমে দুই বৎসরের ছুটি এবং পরে ছুটি বর্ধিত না হওয়ায় চাকুরীতে ইস্তাফা দিয়াও তিনি যুগ-খলীফার নির্দেশে মিশনারীর কার্য করেন। আল্লাহতায়ালার ফজলে তিনি ১৯২৪ সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় হেড মাষ্টারের চাকুরী লাভ করেন এবং ১৯৪০ সালে সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪২ইং হইতে ১৯৪৪ইং পর্যন্ত বঙ্গীয় আহমদীয়া জামাতের এবং পূর্ব পাকিস্তান আহমদীয়া জামাতের আমীর ছিলেন। ১৯৪৯—১৯৫০ সালে তিনি স্বাস্থ্যগত কারণে আমীরের গুরু দায়ীত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৯ সালের পহেলা নভেম্বর ইন্তেকাল করেন। কর্মক্ষেত্রে নীতির প্রশ্নে তিনি অনমনীয়, অকপট এবং প্রখর সত্য-পরায়ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ তাঁহার একটি মূল্যবান উপদেশ স্মর্তব্য : "আপনারা যখনই কোন বন্ধুর মধ্যে দুর্বলতা দেখবেন, তখনই তার সঙ্গে দেখা করুন এবং তার বাসায় রাত্রি যাপন করুন। দেখবেন, তার দুর্বলতা কেটে যাবে।"

(পরবর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

লণ্ডনে অনুষ্ঠিত Deliverance of Jesus from the Cross' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি বাংলাদেশ হইতে প্রতিনিধি হিসাবে হযরত খলিফাতুল মসীহ (আইঃ)-এর অনুমতি ক্রমে অংশগ্রহণ করেন। তাঁহার আন্তরিকতাপূর্ণ উদ্যোগ ও অক্লান্ত পরিশ্রমে হযরত আমীরুল মুমেনীনের অনুমতিক্রমে ঢাকায় বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় দ্বিতল মসজিদ ও জামাতী গেষ্ট হাওউজ নির্মিত হইয়াছে।

বর্তমানে জামাতের আমীর হিসাবে তিনি অক্লান্তভাবে কাজ করিতেছেন এবং সেই সঙ্গে হযরত সাহেব তাঁহাকে পবিত্র কোরআনে বঙ্গানুবাদ কাজের ইনচার্জ হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছেন।

মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব

মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব ১৯০১ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত করিশন্তী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবনে তিনি ওয়েস লিয়েন কলেজ বাঁকুড়া হইতে ১৯২৩ সালে গ্রাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি সিভিল কোর্টে চাকুরী করেন এবং ডিষ্ট্রিক্ট জজ কোর্টের সেরেস্তাদার হিসাবে ১৯৫৬ সালে কুমিল্লা হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৩৪ সালে তিনি সিলসিলা আহমদীয়ায় বয়েত গ্রহণ করেন এবং জামাতের বিভিন্ন কাজের সংগে সংশ্লিষ্ট থাকেন। তিনি ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এবং ১৯৬২ সালের জুলাই হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রথমে পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়া এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন। তিনি ইসলাম ও আহমদীয়াতের খেদমতে নিম্নোক্ত পুস্তকগুলি লিখিয়াছেন : আল্লাহ্-তায়ালার অস্তিত্ব, ওফাতে ঈসা, ইসলামেই নাযাত, খ্রীষ্টান ভাইদের উদ্দেশ্যে নিবেদন, আহমদীয়া জামাত সিরাতে মুস্তাকীমে ১ম ও ২য় খণ্ড, তিনিই আমাদের কৃষ্ণ, হৈ ভারত আনন্দিত হও, মোহাম্মদী মসীহ বিবাহ ও জীবন, কলেমা দর্শন। তিনি হযরত মসীহ মওউদ কর্তৃক লিখিত 'জরুরাতুল ইমাম' পুস্তকের অনুবাদ করেন এবং বাংলায় প্রকাশিত হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর অন্যান্য কয়েকখানি পুস্তকের অনুবাদ কার্যেও বিশেষভাবে সহায়তা করেন। তেমনিভাবে তিনি তফসীর কবীর ও হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক বিভিন্ন গ্রন্থে ব্যক্ত তফসীর অবলম্বনে সুরা ফাতেহার বাংলাভাষায় একটি অনন্যসাধারন তফসীর সংকলন ও প্রণয়ন করেন। তেমনিভাবে তফসীর কবীর' হইতে সুরা ফজর, সুরা মাউন ও সুরা কাওসার-এর অনুবাদ করেছেন যাহা পাক্ষিক আহমদীতে প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও তিনি ছোট ছোট পুস্তিকা এবং অনেক প্রবন্ধের লেখক।

১৯৬৪-৬৬ সালে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)-এর অসুস্থতার সময় তিনি রাবোয়ার নিগরান বোর্ডের অন্যতম সদস্য ছিলেন। রাবওয়ায় 'ওয়াকফে জদীদ বিল্ডিং' এবং মসজিদ আকসার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনে বিশেষভাবে নির্বাচিতদের মধ্যে তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। 'পূর্ব পাকিস্তানে আহমদীয়াতের ইতিহাস' এবং 'আহমদীয়াতের সত্যতার নিদর্শনাবলী' এই দুইটি বিষয়ের উপর উর্দুতে ১৯৬৩ এবং ১৯৬৪ সালে রাবওয়া সালনা জলসায় বক্তৃতা দান করেন। ১৯৬৩ হইতে ১৯৬৯ পর্যন্ত প্রতি বৎসর তিনি রাবওয়া সালানা জলসায় একটি করিয়া অধিবেশনের সভাপতিত্ব করার মর্যাদা লাভ করেন এবং অনুরূপভাবে ১৯৭৩ সালে কাদিয়ান জলসাতেও সদারাত করেন। ১৯৭৪ সালে ভুট্টোর বাংলাদেশ সফরের প্রাক্কালে তাঁহাকে মৌলবী মোহাম্মদ সাহেবের লেখা মেমোর‍্যাণ্ডাম দেওয়া হয় এবং এই মেমোর‍্যাণ্ডাম পাকিস্তানে আহমদীয়া বিরোধী দাঙ্গার প্রতিবেদন পেশ করা হয়—এবং ইহা জাতিসংগেও প্রেরণ করা হয়। ১৯৭৮ সালে জুন মাসে

(অবশিষ্টাংশ পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন)

The Holy Quran has been translated into many languages by the Ahmadiyya Muslim Movement. Photo shows translation of the Holy Quran in German, Esperanto, Indonesia, Logandi, Dutch, Swaheli, and Danish languages.

دنیا کی مختلف زبانوں میں قرآنِ عظیم کے تراجم کے چند نمونے

اسپرنٹو

Capitro 14 Ibrāhīm (Abraham)* 13-a parto

سورة إبراهيم مكية

revelaciita en Mekko

1. Je la nomo de Allah, la Donema, la Pardonema.

2. Alef Lām Rā**. Libro, kiun Ni sendis al vi, por ke vi konduku la homaron for de la mallumo al la lumo per la dekreto de ilia Sinjoro sur la vojon de la Ĉiopova, de la Laŭdegenda.

بسم الله الرحمن الرحيم ۝
الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات
إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ۝
الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل

جرمن

Sura 4 AL-NISA 4. Teil

سورة النساء مدنية

(Offenbart nach der Hidschra)

1. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen.

2. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, Der euch aus einem einzigen Wesen erschaffen hat; aus diesem erschuf Er ihm die Gefährtin, und aus beiden ließ Er viele Männer und Frauen sich vermehren. Fürchtet Allah, in Dessen Namen ihr einander bittet, und

بسم الله الرحمن الرحيم ۝
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام

لوگنڈی

EJJUZU I, ALIF LAAM MIIM 2 ESSUULA AL-BAQARA

EKITUNDU 2

9. Era mu bantu mulimu abalala abagamba nti: tukkiriza Katonda n'olunaku lw'enkomerero, songa sibakkiriza.

10. Baagala okulimba Katonda n'abakkiriza, naye tebalimba

ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر
وما هم بمؤمنين ۝
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون

انڈونیشین

Surah 5 AL-MAIDAH Djuz 7

DJUZ VII

84. Dan apabila mereka mendengar apa jang diturunkan kepada Rasul ini, engkau lihat mata mereka mentjutjurkan air mata,[788] disebabkan mereka telah mengenal kebenaran itu.

وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم
تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون
ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ۝

سواحیلی

سورة المائدة مدنية

5. SURA AL-MAAIDA

Imeteremshwa Madina
Ina mafungu 16 na Aya 121 pamoja na Bismillahi

1. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa rehema, Mwingi wa ukarimu.

2. Enyi mlioamini! tekelezeni wajibu (wenu). Mmehalalishiwa wanyama wenye miguu minne, ila wale mnaosomewa, bila kuhalalisha mawindo mkiwa katika Haji. Hakika Mwe-

بسم الله الرحمن الرحيم ۝
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم
بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد
وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد ۝

ڈچ

HOOFDSTUK 9 ATTAUBAH DEEL X

سورة التوبة مدنية

(Geopenbaard nà de Hidjrah)

1. Dit is de verklaring van ontheffing door Allah en zijn boodschapper tegenover degenen der afgodendienaren met wie gij een verdrag hebt gesloten.

2. Gaat daarom in het land rond voor vier maanden en weet, dat gij Allah niet kunt ontsnappen en dat Allah de ongelovigen zal vernederen.

3. En dit is een verklaring van Allah en Zijn boodschapper aan de mensen op de dag van de grote bedevaart, dat Allah alsmede Zijn boodschapper niets uitstaande

براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من
المشركين ۝
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم
غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين ۝
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج
الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله

ڈینش

sandt[6]. 53. (Josef sagde): Dette (forhør forlangte jeg) for at han ['Azîz] kan vide, at jeg ikke har været troløs mod ham i (hans) fravær, og at Allah ikke leder de troløses list (til sejr). 54. Og jeg anser ikke mig selv for at være fri for fejl, thi sjælen påbyder (ofte) det onde, undtagen for den, som min Herre har vist barmhjertighed, thi min Herre er Tilgivende, Barmhjertig[7]. 55. Og kongen sagde: Bring ham hid. Jeg vil udvælge ham for mig selv. Efter at han havde talt med ham, sagde han: Sandelig, du er fra i dag hos os (en mand, hvis stilling er) stærk (og) betroet. 56. Han sagde: Sæt mig over landets skatkamre, thi jeg er en (god) vogter og vel vidende (om sådanne ting). 57. Og således befæstede Vi Josefs (stilling) i landet. Han boede i det, hvor han ville. Vi skænker Vor barmhjertighed til hvem Vi vil, og Vi lader ikke deres løn gå til spilde, som handler smukt. 58. Men lønnen i det hinsides er sandelig bedre for dem, der tror og handler retfærdigt. 59. Og Josefs brødre kom (også under hungersnøden) og trådte ind til ham. Da

وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء
إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم ۝ وقال الملك
ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك
اليوم لدينا مكين أمين ۝ قال اجعلني على خزائن
الأرض إني حفيظ عليم ۝ وكذلك مكنا ليوسف
في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا
من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ۝ ولأجر الآخرة
خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ۝ وجاء إخوة
يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ۝
ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم
من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير
المنزلين ۝ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم
عندي ولا تقربون ۝ قالوا سنراود عنه أباه

বিভিন্ন ভাষায় জামাতে আহ্‌মদীয়া কর্তৃক অনূদিত পবিত্র কুরআন শরীফের কয়েকখানি পাতা

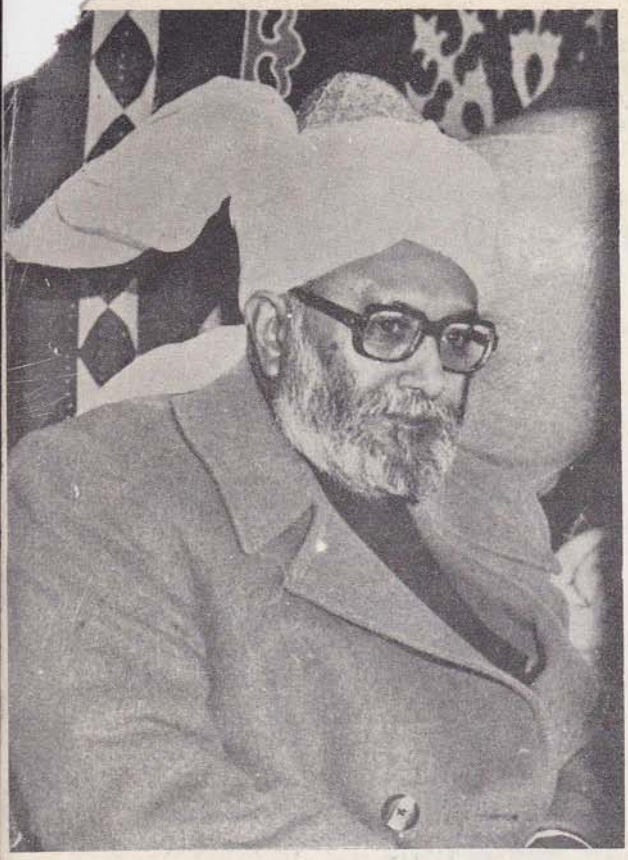

প্রফেসার আবদুস সালাম সাহেব

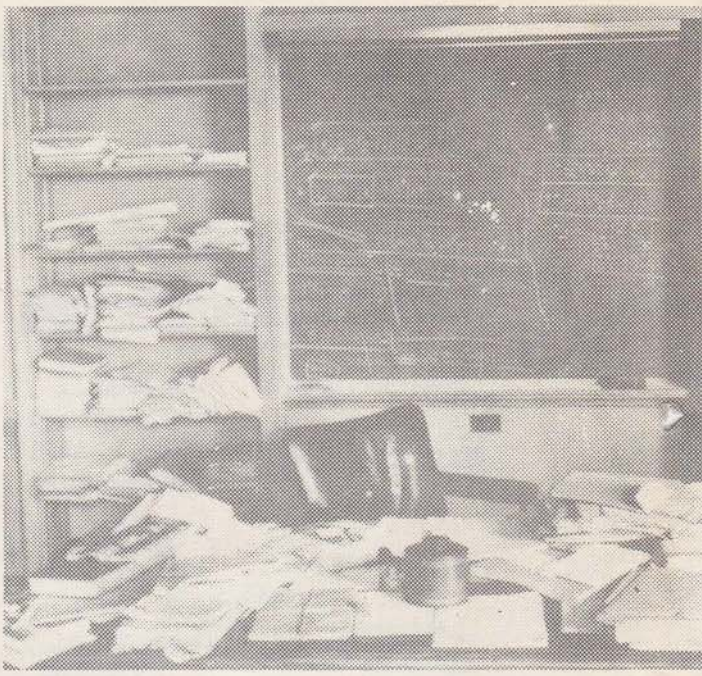

EINSTEIN'S UNFINISHED WORK ON THE COSMOS IS APPARENT FROM A PHOTOGRAPH OF HIS PRINCETON STUDY TAKEN SOON AFTER HIS

The Ultimate Questions

When Albert Einstein died in 1955, his marvellous brain had created much of the mathematical framework for understanding the microcosmic laws of the atom and the macrocosmic laws of the universe. At his death he was trying to synthesize the two in one set of equations, one "Unified Field Theory". This problem still remains unsolved—as do other cosmic questions

Life Nature Library, " THE UNIVERSE " গ্রন্থের ১৭৭ পৃষ্ঠার ছবি। উল্লেখ্য যে, মৃত্যুকাল পর্যন্ত আলবার্ট আইনস্টাইন যে সমস্যার সমাধান করতে অসমর্থ হন, সম্প্রতি প্রফেসর আবদুস সালাম সাহেব তাহা সমাধান করে নোবেল প্রাইজ দ্বারা ভূষিত হন।

নোবেল প্রাইজ বিজয়ী প্রফেসার আব্দুস সালাম

প্রফেসার আবদুস সালাম একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক। ১৯৭৮ সালে তিনি তাঁর মর্যাদাপূর্ণ গবেষণামূলক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ দ্বারা ভূষিত হয়েছেন। এক দিক দিয়ে তিনি যেমন অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী বিজ্ঞানী, অন্যদিক দিয়ে তিনি তেমনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান এবং আহ্‌মদীয়া জামাতের একজন মুখলেস সদস্য। তিনিই প্রথম মুসলমান বৈজ্ঞানিক যিনি বিশ্বের এই সর্বোচ্চ সম্মান তথা নোবেল প্রাইজ লাভ করে সমস্ত মুসলিম বিশ্বের জন্য গৌরবের অধিকারী হয়েছেন। এই কারণে বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং অন্যান্য সকল মুসলিম দেশ হতে অত্যন্ত গর্ব এবং প্রীতিভরে তাঁকে অভিনন্দিত করা হয়েছে মুসলিম দেশ ছাড়াও অন্যান্য দেশ হতেও তাঁকে অসংখ্য অভিনন্দন বাণী প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর এই সম্মান ও মর্যাদা তাঁর জন্য, জামাতে আহ্‌মদীয়ার জন্য এবং সমগ্র মুসলিম জাহানসহ সারা বিশ্বের জন্য আশীস-মণ্ডিত করুন আমরা এই কামনা করি।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ আলবার্ট আইন্সষ্টাইন দীর্ঘ ৩০ বছর ব্যাপী ৪টি শক্তি অর্থাৎ (ক) মধ্যাকর্ষণ শক্তি, (খ) শক্তিশালী আনবিক শক্তি, (গ) দুর্বল আনবিক শক্তি এবং (ঘ) বৈদ্যুতিক-চুম্বক শক্তির পারস্পরিক সংযোগ ও অভিন্ন ভিত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে থাকেন—কিন্তু এই সম্বন্ধে তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে ব্যর্থ হন। প্রফেসার আবদুস সালাম আল্লাহ্‌তায়ালার ফযলে বৈজ্ঞানিক এবং ইসলামিক একত্ববাদের মুল-সূত্রের প্রেক্ষিতে উল্লেখিত ৪টি শক্তির একক এবং অভিন্ন বুনিয়াদ উদ্ভাবন করতে সক্ষম হন। তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্বটি [Unified Field Theory] অদূর ভবিষ্যতে পদার্থ বিজ্ঞানে বিপ্লবের সৃষ্টি করবে। সেই সংগে তাঁর এই গবেষনার ফলে ইসলামের তৌহীদবাদের সত্যতা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও সপ্রমাণিত হয়েছে।

প্রফেসার আবদুস সালাম সাহেবের পিতা মোহ্‌তারম মোহাম্মদ হোসেন সাহেব পাকিস্তানের পশ্চিম পাঞ্জাবের ঝং জেলার জামাতে আহ্‌মদীয়ার জেলা প্রেসিডেন্ট ছিলেন। শৈশবে আবদুস সালাম সাহেব খুবই কম কথা বলতেন এবং এই কারণে তাঁর পিতা তাঁকে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর একজন বুজুর্গ সাহাবী হযরত গোলাম রসুল রাজেকী (রাঃ -এর নিকট নিয়ে আসেন এবং দোওয়ার দরখাস্ত করেন। রাজেকী সাহেব (রাঃ) দোওয়া করলেন এবং বাচ্চার মাথায় হাত রেখে বললেন—"এতনা বলেগা কে দুনিয়া সুনে গি।" বলা বাহুল্য, হযরত রাজেকী (রাঃ) সাহেবের এই দোওয়া কালক্রমে আল্লাহতায়ালার ফজলে অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে।

স্মরণিকা/১৯৭৯

নোবেল প্রাইজের গৌরব বিজয়ের ঘোষণা শোনামাত্র প্রফেসার আব্দুস সালাম সাহেব প্রথমে লণ্ডনস্থ আহমদীয়া মসজীদে যান আল্লাহ্তায়ালার শুকরিয়া আদায়ের জন্য। তারপর সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকারের সময় বলেন—"এই সম্মান অর্জনকারী প্রথম মুসলমান হিসাবে আমি খুবই আনন্দিত।" তিনি আরও বলেন—"ধর্ম ও বিজ্ঞানে কোন বিরোধ নেই, তবে উভয়ের পদ্ধতি ভিন্ন।" মহান বিজ্ঞানী হিসাবে দুনিয়ার পত্র-পত্রিকা যেমন তাঁকে অভিনন্দিত করেছে তেমনি বলেছে নিষ্ঠাবান মুসলমান। পাকিস্তানের রেডিও থেকে ঘোষণা করা হয় যে, "তাহার নোবেল পুরস্কার বিজয়ে মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান মহা গৌরব বোধ করে।' পরমানু বিজ্ঞানে অনন্য-সাধারণ অবদানের জন্য ইতিপূর্বে ১৯৬৮ সালে 'শান্তির অণু' বিষয়ক গবেষণার জন্য এই 'শান্তির দাস' (আব্দুস সালাম) "শান্তির জন্য অনু" পুরস্কার লাভ করেন।

১৯২৬এর ২৬শে জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন মোহতারম আব্দুস সালাম। প্রতিটি পরীক্ষায় শীর্ষস্থান দখল করেছিলেন তিনি। বিশ বছর বয়সে গ্রাজুয়েট হন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পি,এইচ,ডি, করেন কেমব্রিজের সেন্টজন কলেজ থেকে। রয়েল সোসাইটির ফেলো পদ লাভ করেন মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি 'ডবল ফার্ষ্ট' হবার গৌরব লাভ করেন ১৯৪৯ সালে। ১৯৫১—৬১ পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন সেন্ট জনে। ১৯৫৭ থেকে তিনি লণ্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজিতে অধ্যাপনা করছেন এবং একই সংগে ইটালীর ট্রিষ্টে সেন্টারের ডিরেক্টর হিসাবে কর্মরত আছেন। তিনি সুইডিন রয়েল বিজ্ঞান একাডেমীর ফেলো এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান একাডেমীরও ফেলো। আনবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য অনুষ্ঠিত প্রথম ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের সায়েন্টিফিক সেক্রেটারী ছিলেন তিনি। তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত জাতিসংঘের উপদেষ্টা কমিটিরও সদস্য। আন্তর্জাতিক বহু সম্মান অর্জন করেন তিনি। ১৯৬৯—৭৪পর্যন্ত তিনি ছিলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের প্রধান বিজ্ঞান উপদেষ্টা। ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানে রাজনৈতিক ভিত্তিতে ভুট্টো কর্তৃক আহমদী সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণার প্রতিবাদে তিনি এই পদ থেকে ইস্তাফা দেন। পরে বহু তোষামোদ করেও ভুট্টো সাহেবেরা তাঁকে আর রাজী করাতে পারেন নি। অবশ্য পাকিস্তানের বর্তমান প্রধান সামরিক শাসক আন্তরিক মোবারবাদ জানিয়াছেন অধ্যাপক আব্দুস সালামকে পাকিস্তান এবং জনগণের তরফ থেকে এবং তাঁকে সম্মানসূচক পাঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডক্টোরেট ডিগ্রি প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের সরকার এবং পত্র-পত্রিকার পক্ষ থেকেও আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়েছে। আমাদের দেশের ও জামাতের অনেকের সংগে ব্যক্তিগত পরিচয় আছে ডঃ আব্দুস সালামের। অনেক গুণগ্রাহী শুভাকাংখী ছাত্রও আছে তাঁর এদেশে। এদের অনেকেই মোবারকবাদ জানিয়েছেন তাঁকে। জামাতের সকলের তরফ থেকে মোবারকবাদ জানিয়েছেন মোহতারম আমীর সাহেব, বাংলাদেশে আঞ্জুমানে আহমদীয়া। সাইয়েদানা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) সম্প্রতি ডঃ আব্দুস সালামের নোবেল পুরস্কার বিজয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন অবং তাঁর জন্য দোয়া ভরা প্রশংসা করেছেন। আল্লাহতায়ালা মোহতারম অধ্যাপক আব্দুস সালামকে সুখী, সুন্দর ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু দান করুন। তাঁকে বার বার সাফল্য দান করুন, তাঁর হাফেজ ও নাসের হউন। আমীন।